ঘরে-বাইরে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১৭ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

ঘরে-বাইরে

প্রথম সংস্করণ	...	১৯১৫ সাল
দ্বিতীয় সংস্করণ	..	১৯১৮ "
তৃতীয় সংস্করণ	..	১৯২০ "
*	*	*
চতুর্থ (বিশ্বভারতী সংস্করণ)		১৯২৬ "

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

১

মাগো, আজ মনে প'ড়্‌চে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে সাড়ী সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখ্‌চি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণ-রাগ-রেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা ক'রে বেরিয়েছিলো। তার পরে? পথে কালো মেঘ কী ডাকাতের মতো ছুটে এলো? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌লো না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সেই যে উষা-সতীর দান; দুর্য্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিলো শাম্‌লা, তাঁর দীপ্তি ছিলো পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্ব্বকে লজ্জা দিতো।

আমি মায়ের মতো দেখ্‌তে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলে-বেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ ক'রেচি। মনে হ'লো আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা অন্যায়,—আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর কারো জিনিষ, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম্। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে ব'লেছিলো,—এ মেয়েটি সুলক্ষণা, সতী-লক্ষ্মী হবে।—মেয়েরা সবাই ব'ল্‌লে, তা হবেই তো বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখ্‌তে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হ'লো। তাঁদের কোন্ কালের বাদসাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথায় রাজপুত্রের কথা শুনেছি,—তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিলো।—রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপ্‌ড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে সব কুমারী শিবপূজা ক'রে এসেছে তাদেরই একাগ্রমনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দু'টি ডানার মতো—যেমন কালো, তেম্‌নি কোমল।

স্বামীকে দেখ্‌লুম্ তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন কি, তাঁর রঙ দেখ্‌লুম্ আমারি মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সঙ্কোচ ছিলো সেটা কিছু ঘুচ্‌লো বটে কিন্তু সেই

সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও প'ড়্লো। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় ম'রেই যেতুম্, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিলো তাকে একবার চোখে চোখে দেখ্তে পেলুম্ না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়—সেখানে তাকে কোনো সাজ ক'রে আস্তে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্য্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হ'য়ে ওঠে সে আমি ছেলে-বেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ ক'রে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ ক'রে কেওড়া জলের ছিটে দেওয়া কাপড়ের টুক্রোয় আলাদা জুড়িয়ে রাখ্তেন, তিনি খেতে ব'স্লে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন; তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়্তো সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝ্তুম্।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিলো না? ছিলো। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর। সমস্ত জীবনকে যদি জীবন-বিধাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি স্তবগান ক'রে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ ক'রেছিলো।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন

স্বামীর পায়ের ধূলো নিতুম্ তখন মনে হ'তো আমার সিঁথের সিঁদূরটি যেন শুকতারার মতো জ্ব'লে উঠ্‌লো। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে ব'ল্‌লেন, "ও কি বিমল, ক'র্‌চো কি ?" আমার সে লজ্জা ভুল্‌তে পার্‌বো না। তিনি হয় তো ভাব্‌লেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জ্জন ক'র্‌চি। কিন্তু নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়,—সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালবাসা আপনিই পূজা ক'র্‌তে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগল-পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনু-পরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন, আর এম, এ পাশ করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে, অল্পবয়সে মারা গেছেন—তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই—এ বংশে এটা এতো খাপছাড়া যে, সকলে এতোটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্ম্মল হওয়া তাদেরই সাজে ; কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হ'লো আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু হ'য়েছে। আমার দিদিশাশুড়ীই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এই জন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডী ডিঙিয়ে চ'ল্‌তে সাহস ক'র্‌তেন। এই জন্যেই তিনি যখন মিস্ গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত

ক'র্‌লেন তখন ঘরে বাইরে যতো রসনা ছিলো তার সমস্ত রস বিষ হ'য়ে উঠ্‌লো, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইলো।

সেই সময়েই তিনি বি, এ, পাশ ক'রে এম্‌ এ প'ড়্‌ছিলেন। কলেজে প'ড়্‌বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাক্‌তে হ'তো। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি ক'রে চিঠি লিখ্‌তেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তো।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখ্‌তুম্‌, আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম্‌। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র ব'সেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রাণী, তাঁর কাছে আমি ব'স্‌তে পেরেচি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ—তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া ক'রেচি সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখানকার ভাষাতেই পরিচয় হ'য়ে গেছে। আমার আজ্‌কের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিতার মতো শোনাচ্চে। এ কাব্যের সঙ্গে যদি আমার মোকাবিলা না হ'তো তা হ'লে আমার সেদিনকার সেই ভাব্‌টাকে সোজা গদ্য ব'লেই জান্‌তুম্‌—মনে জান্‌তুম্‌ মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘরগড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেম্‌নি-সহজ কথা—এর মধ্যে

বিশেষ কোনো একটা অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্য্য আছে কিনা সেটা এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভাব্‌বার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে আর এক যুগে এসে প'ড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিলো এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার উপদেশ আস্‌চে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা, সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে যে কী অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে ব'ল্‌চেন। তার থেকে বোঝা যাচ্চে জীবনের এই জায়গায় কেমন ক'রে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়ে মানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করিনে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিষটি ছিলো—সেই ভক্তি ক'র্‌বার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌চি যখন সেটা বাইরের দিক্ থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিলো তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী ক'রে থাকে। তাতে পূজারী ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু এতো সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিষপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইলো। এই সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান ক'র্‌বো কোন ফাঁকে? আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশী ছিলো। প্রেম যে স্বভাব-বৈরাগী, সে যে পথের ধারে ধূলার পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়. সে তো বৈঠকখানার চিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য্য মেল্‌তে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিলো আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেল্‌তে পার্‌তেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে পার্‌তো না। আমি জান্‌তুম্ ঠিক কখন তিনি আস্‌বেন—তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হ'য়ে আমাদের মিলন ঘ'ট্‌তে পার্‌তো না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল—সে আস্‌তো ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন ক'রে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদূরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো সাড়ীটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহমনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন ক'রে দিতুম্। সেই সময়টুকু, অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর ব'লে এসেচেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করিনি।

কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান ক'র্তে চায়। তাই, সমান হ'তে থাক্বার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়—কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিষ হ'য়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আর-তির আলোর মতো—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হ'য়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা ক'রেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক্ ধিক্! আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে প'ড়্তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাওনি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো ক'র্তে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছো, শিখিয়ে ভালোবেসেছো, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছো, যা চাইনি তা দিয়ে ভালোবেসেছো,—আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়েনি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস প'ড়েছে তা দেখেছি;—আমার দেহকে তুমি এমন ক'রে ভালোবেসেছো যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এম্নি ক'রে ভালোবেসেছো যেন সে তোমার সৌভাগ্য। এতে আমার মনে গর্ব্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারি ঐশ্বর্য্য যার লোভে তুমি এমন ক'রে আমার দ্বারে এঁসে দাঁড়িয়েছো। তখন রাণীর সিংহাসনে ব'সে মানের দাবী করি, সে দাবী কেবল

বাড়্‌তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ ক'র্‌বার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে ক'রেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্ব্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শঙ্কর তো ভিক্ষুক হ'য়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পার্‌তেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না ক'র্‌তেন?

আজ মনে প'ড়্‌চে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কতো লোকের মনে কতো ঈর্ষ্যার আগুন ধিকিধিকি জ্ব'লেছিলো। ঈর্ষ্যা হবারই তো কথা—আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না,—দাম দিতেই হবে নইলে বিধাতা সহ্য করেন না—দীর্ঘকাল ধ'রে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ ক'র্‌তে হয় তবেই স্বত্ব ধ্রুব হ'য়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিষও আমরা পাইনে এমনি আমাদের পোড়া কপাল!

আমার সৌভাগ্যে কতো কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস প'ড়েছিলো। আমার কি তেম্‌নি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেচে। আমার দিদিশাশুড়ী, শাশুড়ী সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিলো। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দু'জনেরই কপাল ভাঙ্‌লো তখন আমার দিদিশাশুড়ী পণ ক'রে ব'সলেন যে তাঁর এক-

মাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ ক'র্‌বেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌লুম্‌—নইলে আমার আর কোনো অধিকার ছিলো না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই না কি এখানকার নিয়ম, তাই, মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারী মাংসের লোভে পাপের পণ্য-শালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় ক'রে ফির্‌লেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ ক'র্‌বার মতো কোন্‌ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল—আর কিছুই না! আর তাঁদের বেলা-তেই কি পোড়া বিধাতার হুঁস ছিলো না—সকল অক্ষরই বাঁকা হ'য়ে উঠ্‌লো! সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেলো—কেবল রূপ-যৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধ'রে মিছে জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লো। কোথাও সঙ্গীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা।

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা ক'র্‌বার ভান ক'র্‌তেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো? কথায় কথায়

তাঁদের কতো খোঁটাই খেয়েছি! আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ চুরি ক'রে ক'রে নিচ্চি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম; এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হালফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই সমস্ত রঙ্-বেরঙের জেকেট সাড়ী শেমিজ পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্ব'ল্‌তে থাক্‌তেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট্! দেহটাকে যে একেবারে দোকান ক'রে সাজিয়ে তুল্‌লে গো—লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জান্‌তেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বারবার ব'ল্‌তেন রাগ কোরো না!—মনে আছে আমি একবার তাঁকে ব'লেছিলুম্ মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা! সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো ক'রে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেল্‌চে—দান-পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবী ক'র্‌তেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবী ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র ক'র্‌তেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্ব'ল্‌তে থাক্‌তো যখন দেখ্‌তুম্ তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন কি, আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে নিত উপবাসে ভয়ঙ্কর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যাঁর মুখে এতো বেশী

খরচ হ'তো যে মনের জন্যে শিকি পয়সার, বাকি থাক্‌তো না,—তিনি বারবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'ল্‌তেন, যে, তাঁকে তাঁর উকিল দাদা ব'লেছেন যদি আদালতে তিনি নালিশ করেন তা হ'লে তিনি—সে কতো কি, সে আর ছাই কি লিখ্‌বো। আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব ক'র্‌বো না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হ'তো; আমার মনে হ'তো, ভালো হবার একটা সীমা আছে—সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী ব'ল্‌তেন আইন কিংবা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের ব'লেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে চিন্তে নিতে হ'চ্চে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা? মার খেয়ে আবার বখ্‌শিশ দিতে হবে?—সত্য কথা ব'ল্‌বো? অনেকবার আমি মনে ভেবেছি, আর একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিলো।

আমার মেজো জা অন্য ধরণের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং ক'র্‌তেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্ত্তা হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিলো। যে সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি ক'র্‌বার লোক ছিলো না--কেননা এবাড়ীর ঐ রকমই দস্তুর। আমি বঝতম আমা

জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠ্‌লো, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিলো। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেলো তলিয়ে। এই সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌তো, শত্রুপক্ষ ঠাট্টা ও বিদ্রূপ ক'র্‌তো। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'ল্‌লেন, তাঁর বিখ্যাত উকীল খুড়তুত ভাই তাঁকে ব'লেচেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়-সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হ'তে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিলো না। তিনি আমাকে ডেকে কতোবার ভর্ৎসনা ক'রেচেন, ব'লেচেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত ক'র্‌চিস্‌! বিষয়সম্পত্তির কথা ভাব্‌ছিস্‌? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভারের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়ে মানুষের মতো? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবৌ তোর কপাল ভাল, যে, সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়্‌চে না। দুঃখ পাস্‌নি ব'লেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিষ্ট ছিলো খুব লম্বা। তাঁতের কল, কিম্বা ধানভানার যন্ত্র কিম্বা ঐ রকম একটা-কিছু যে কেউ তৈরি ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্য্যন্ত তিনি সাহায্য ক'রেচেন। বিলাতি কম্পানির সঙ্গে টক্কর

দিয়ে পুরী যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কম্পানি উঠ্‌লো; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেচে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগ্‌তো সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার ক'র্‌তে যাবেন. ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য উটকামন্দে যেতে হবে, নির্ব্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েচেন; এ ছাড়া সংসার খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী ব'ল্‌তেন দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার ক'র্‌তে না পার্‌লে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেম্‌নি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ ক'রে ব'লেছিলুম্ এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্চে—তিনি হেসে ব'ল্‌লেন, আমার গুণ নেই অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্চি—আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ ক'রে নিলুম্।

এই পূর্ব্বযুগের পরিচয় কিছু ব'লে রাখা গেলো, নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বুঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগ্‌লো আমি প্রথমেই স্বামীকে ব'ল্‌লুম্ বিলিতি জিনিষে তৈরি আমার সম

পোষাক পুড়িয়ে ফেল্‌বো। স্বামী ব'ল্‌লেন, "পোড়াবে কেন? যতোদিন খুসী ব্যবহার না ক'র্‌লেই হবে।"

কী তুমি ব'ল্‌চো যতদিন খুসী! ইহজীবনে আমি কখনো—

বেশ তো ইহজীবনে তুমি না হয় ব্যবহার ক'র্‌বে না। ঘটা ক'রে নাই পোড়ালে!

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্চ?

আমি ব'লচি গ'ড়ে তোল্‌বার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ ক'র্‌তে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গ'ড়ে তোল্‌বার সাহায্য হয়।

তাই যদি বলো তবে ব'ল্‌তে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বাল্‌বার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখ্‌তেই বাহাদুরী কিন্তু আসলে দুর্ব্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী ব'ল্‌লেন,"দেখো, বুঝ্‌চি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্চে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে ব'ল্‌চি ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেম্‌নি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্চে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে

করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ—এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।”

তার পরে আর এক ল্যাঠা। মিস্ গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিলো তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চ’লেছিলো। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা প’ড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠ্‌লো। মিস্ গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালী অনেকদিন সে কথা আমারও মনে হয় নি—কিন্তু মনে হ’তে সুরু হ’লো। আমি স্বামীকে ব’ল্‌লুম্ মিস্ গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ্ ক’রে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এলো তাই ব’লেছিলুম্ তিনি ম্লান মুখ ক’রে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম্। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হ’লো তিনি রাত্রে এসে ব’ল্‌লেন, দেখো, মিস্ গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ ব’লে ঝাপ্‌সা ক’রে দেখ্‌তে আমি পারি নে। এতোদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচ্‌বে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হ’য়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে ব’ল্‌লুম্, আচ্ছা থাক্ না, ওকে কে যেতে ব’ল্‌চে?

মিস্ গিল্‌বি র’য়ে গেলো। একদিন গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান ক’র্‌লে। আমার স্বামীই এতোদিন সেই ছেলেকে পালন ক’রেছিলেন,—তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠ্‌লো।

সেই ছেলে যা ব'ল্‌লে সবাই তাই বিশ্বাস ক'র্‌লে। লোকে ব'ললে মিস্‌ গিল্‌বিই তাকে অপমান ক'রেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে ব'লেছে। আমারও কেমন মনে হ'লো সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধ'র্‌লে। আমি তার হ'য়ে অনেক চেষ্টা ক'র্‌লুম্‌ কিন্তু কোনো ফল হ'লো না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌লে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই ক'র্‌লুম্‌। এইবার মিস্‌ গিল্‌বি আপনিই চ'লে গেলো। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌লো—কিন্তু আমার মন গ'ল্‌লো না। আহা মিথ্যা ক'রে ছেলেটার এমন সর্ব্বনাশ ক'রে গেলো গো? আর অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া খাওয়া ছিলো না—আমার স্বামী নিজের গাড়িতে ক'রে মিস্‌ গিল্‌বিকে ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হ'লো। এই কথাটা নিয়ে নানা ডাল পালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হ'লো এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিলো।

ইতিপূর্ব্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্বিগ্ন হ'য়েছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করিনি। এবার লজ্জা হ'লো। মিস্‌ গিল্‌বির প্রতি নরেন কি অন্যায় ক'রেছে না ক'রেছে সে আমি জানিনে কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্বিচার ক'র্‌তে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য

ক'র্‌তে পেরেচে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাইনে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝ্‌তে চাইলেন না, আমাব মনে হ'লো সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হ'লো।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিলো যে আমাকে হার মান্‌তে হ'য়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ ক'র্‌লে কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল ক'র্‌লে না। এই তো আমাব সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডব সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিলো না বা তিনি এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দেমাতরম্‌' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত ক'রে গ্রহণ ক'র্‌তে পারেন নি। তিনি ব'ল্‌তেন, দেশকে আমি সেবা ক'র্‌তে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা ক'র্‌বো যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্ব্বনাশ করা হবে।

৪

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচাব ক'রবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। বিকেল বেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের একদিকে চিক্‌ ফেলে ব'সে আছি। 'বন্দেমাতরম্‌' শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আস্‌চে, আমার বুকের ভিতরটা গুরগুর ক'রে কেঁপে উঠ্‌চে। হঠাৎ

পাগ্‌ড়ি-বাঁধা গেরুয়াপরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার মতো, হুড়হুড় ক'রে ঢুকে প'ড়্‌লো। লোকে লোকে ভ'রে গেলো। সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশবারোজন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে ক'রে নিয়ে এলো। বন্দেমাতরম্‌, বন্দেমাতরম্‌, বন্দেমাতরম্‌! আকাশটা যেন ফেটে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে প'ড়্‌বে মনে হ'লো।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্ব্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিলো তা ব'ল্‌তে পারিনে। কুশ্রী দেখ্‌তে নয়, এমন কি, রীতিমতো সুশ্রীই; তবু জানিনে কেন, আমার মনে হ'য়েছিলো, উজ্জ্বলতা আছে বটে কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া—চোখে আর ঠোঁটে কী একটা আছে যেটা খাঁটি নয়।

সেই জন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবী পূরণ ক'র্‌তেন আমার ভালো লাগ্‌তো না। অপব্যয় আমি সইতে পার্‌তুম্‌, কিন্তু আমার কেবলি মনে হ'তো বন্ধু হ'য়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্চে। কেননা ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরীবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে অথচ—এই রকম নানা কথা আমার মনে উদয় হ'য়েছিলো। আজ সেই সব কথা মনে উঠ্‌চে—কিন্তু থাক্‌।

কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর

এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হ'লো, তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখ্‌লুম্। বিশেষত এক সময় সূর্য্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হ'লো তিনি যে অমরলোকের মানুষ, এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সাম্‌নে প্রকাশ ক'রে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দম্‌কা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সাম্‌নে যেটুকু চিকের আড়াল ছিলো সে আমি সইতে পার্‌ছিলুম্ না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম্ আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিলো না আমার মুখ দেখ্‌বার যার একটু অবকাশ ছিলো। কেবল এক সময় দেখ্‌লুম্ কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে প'ড়্‌লো। কিন্তু আমার হুঁস্ ছিলো না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ ? আমি তখন বাংলা-দেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি—আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্য্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর প'ড়েচে, তেম্‌নি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কি ক'রে ?

আমি স্পষ্টই অনুভব ক'র্‌তে পার্‌লুম্ আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠ্‌লো।

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মান্‌তে চাইলো না—বজ্রের উপর বজ্রের গর্জ্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চম্‌কানি। আমার মন ব'ল্‌লে আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ এবং অহঙ্কারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম্। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্ত্তে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেলো। আমার ইচ্ছা ক'র্‌তে লাগ্‌লো গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা ক'র্‌বার জন্য—আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাক্‌তো তাহ'লে আমার কণ্ঠী আমার গলার হার আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খ'সে খ'সে প'ড়ে যেতো। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি ক'র্‌তে পার্‌লে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হ'তে পার্‌তো।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হ'তে লাগ্‌লো পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাহ'লে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা ক'র্‌তে পার্‌তুম্।

কিন্তু তিনি আমাকে কোনো কথাই ব'ললেন না। সেটাও

আমাকে ভালো লাগ্‌লো না। তাঁর উচিত ছিলো বলা, "আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হ'লো, এসব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেলো।" আমার কেমন মনে হ'লো তিনি কেবল জেদ ক'রে চুপ ক'রে আছেন, জোর ক'রেই উৎসাহ প্রকাশ ক'র্‌চেন না।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "সন্দীপবাবু আর কতোদিন এখানে আছেন?"

স্বামী ব'ল্‌লেন, "তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।"

কাল সকালেই?

হাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হ'য়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ্‌ ক'রে রইলুম্‌। তার পরে ব'ল্‌লুম্‌, "কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?"

সে তো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বলো দেখি?

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াবো।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। এর পূর্ব্বে অনেক দিন অনেকবার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ ক'রেচেন। আমি কিছুতেই রাজি হইনি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে একরকম ক'রে চাইলেন—আমি তার মানেটা ঠিক্‌ বুঝ্‌লুম্‌ না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হ'লো। ব'ল্‌লুম্‌, "না, না, সে কাজ নেই।"

তিনি ব'ল্‌লেন, "কেনই বা কাজ নেই? আমি সন্দীপকে

ব'ল্‌বো—যদি কোনো রকমে সম্ভব হয় তাহ'লে কাল সে থেকে যাবে।"

দেখ্‌লুম্ সম্ভব হ'লো।

আমি সত্য কথা ব'ল্‌বো। সেদিন আমার মনে হ'চ্ছিলো ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য্য সুন্দর ক'রে গ'ড়্‌লেন না? কারো মন হরণ ক'র্‌বার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক্ একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু বাইরের রূপ না হ'লে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখ্‌তে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখ্‌তে পারেন? না, মনে ক'র্‌বেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এ বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘ'সে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ ক'রে জড়িয়ে ছিলুম্। দুপুর বেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা ক'রে বাঁধ্‌বার সময় ছিলো না। গায়ে ছিলো জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি সাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাতকাটা জ্যাকেট্।

আমি ঠিক ক'রেছিলুম্ এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর কিছু হ'তে পারে না। এমন সময় আমার মেজ জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁট দুটো খুব টিপে একটু হাস্‌লেন। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "দিদি তুমি হাস্‌লে যে?"

তিনি ব'ল্লেন, "তোর সাজ দেখ্চি।"

আমি মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লুম্, "এম্নিই কি সাজ দেখ্লে?"

তিনি আর একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে ব'ল্লেন, "মন্দ হয়নি ছোট রাণী, বেশ হ'য়েচে! কেবল ভাব্চি সেই তোমার বিলাতি দোকানের বুককাটা জামাটা প'র্লেই সাজটা পুরোপূরি হতো।"

এই ব'লে তিনি কেবল তাঁর মুখ চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গী হাসিতে ভ'রে ঘর থেকে চ'লে গেলেন। খুব রাগ হ'লো এবং মনে হ'লো সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা সাড়ি পরি। কিন্তু সে ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত কেন যে পালন ক'র্তে পার্লুন্ না ঠিক জানিনে। মনে মনে ব'ল্লুম্ "আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না ক'রেই সন্দীপবাবুর সাম্নে বেরোই তাহ'লে আমার স্বামী রাগ ক'র্বেন—মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।"

ভেবেছিলুন্, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন ব'স্বেন তখন তাঁর সাম্নে বেরবো। সেই খাওয়ানো কর্ম্মটার আড়ালে প্রথম দেখার সঙ্কোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু খাবার তৈরি হ'তে আজ দেরি হ'চ্চে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ ক'র্বার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেক্ছিলো। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর ক'রে ব'লে ফেল্লুম্—"আজ খেতে আপনার দেরি হ'য়ে গেলো।"

তিনি অসঙ্কোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে ব'ল্লেন, "দেখুন, অন্ন তো রোজই একরকম জোটে কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন না হয় আড়ালেই রইলো।"

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেম্নি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে ক'র্‌তে পারে এ সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে ব'স্‌বার স্বাভাবিক দাবী যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হ'তে লাগ্‌লো পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেলে জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে উঠ্‌বে, কোথাও বাধ্‌বে না, এক একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘ'টে উঠ্‌লো না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো—নিজেকে হাজারবার ভং'সনা ক'রে ব'ল্‌লুম্‌, "কেন ওর সাম্‌নে এমন হঠাৎ বের হ'তে গেলুম্‌।"

কোনো রকম ক'রে খাওয়ানোটা হ'য়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছিলুম্‌—তিনি আবার তেম্‌নি নিঃসঙ্কোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগ্‌লে ব'ল্‌লেন,—"আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাবার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেচেন ব'লে। যদি খাওয়ার পরে অম্‌নি পালান তাহ'লে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।"

এমন সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না ব'ল্‌লে ভারি বদ্‌স্থর লাগ্‌তো। আমার স্বামী যে ওঁর পরমবন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই ক'রে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে ব'ল্‌লেন,"আচ্ছা, তুমি তাহ'লে তোমার খাওয়া সেরে চ'লে এসো।"

সন্দীপবাবু ব'ল্‌লেন,"কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।"

আমি একটু হেসে ব'ল্‌লুম, "আমি এখনি আস্‌চি।"

তিনি ব'ল্‌লেন,"আপনাকে কেন বিশ্বাস করিনে তা বলি। আজ ন'বছর হ'লো নিখিলেশের বিয়ে হ'য়েচে। এই ন'টি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচেন। আবার ফের যদি ন'বছর করেন তাহ'লে আর দেখা হবে না।"

আমিও আত্মীয়তা স্থরু ক'রে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ব'ল্‌লুম, "কেন, তাহ'লেই বা দেখা হবে না কেন ?"

তিনি ব'ল্‌লেন, "আমার কুষ্ঠিতে আছে আমি অল্প বয়সে ম'র্‌বো। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হ'লো।"

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজ্‌বে। বাজ্‌লোও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগ্‌লো। আমি ব'ল্‌লুম, "সমস্ত দেশের আশীর্ব্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।"

তিনি "ব'ল্‌লেন, "দেশের আশীর্ব্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাবো। সেই জন্যেই তো এতো ব্যাকুল হ'য়ে আপনাকে আস্‌তে বলেচি, তা হ'লে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।"

স্রোতের জল ঘোলা হ'লেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এম্‌নি দ্রুতবেগে সচল যে, আর একজনের মুখে যা সইতো না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি ক'র্‌বার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লেন, "দেখুন আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম্‌, আপনি যদি না আসেন তাহ'লে ইনিও খালাস পাবেন না।"

আমি যখন চ'লে আস্‌চি, তিনি আবার ব'লে উঠ্‌লেন, "আমার আর একটু সামান্য দরকার আছে।"

আমি থম্‌কে ফিরে দাঁড়ালুম্‌। তিনি ব'ল্‌লেন, "ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে—খাবার খানিক পরে খাই।"

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হ'লো, "কেন বলুন দেখি?"

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণ রোগ হ'য়েছিলো তার ইতিহাস এলো। প্রায় সাত মাস ধ'রে তাঁর কি রকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুন্‌লুম্‌। এলোপ্যাথ্‌ হোমিওপ্যাথ্‌ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হ'য়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কি রকম আশ্চর্য্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি ব'ল্‌লেন, "ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এম্‌নি

ক'রে গ'ড়েচেন যে, স্বদেশী বড়িটুকু হাতে হাতে না পেলে তারা বিদায় হ'তে চায় না।"

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে ব'ল্‌লেন,"আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়্‌তে চায় না— তোমার ব'স্‌বার ঘরের তিন্‌টি শেল্‌ফ্ যে একেবারে—"

ওগুলো কি জানো? প্যুনিটিভ পুলীসের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়—আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে—কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যুক্তি সইতে পারেন না। কিন্তু অলঙ্কার-মাত্রই যে অত্যুক্তি, সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে ব'লেছিলুম্, "গাছ পালা পশু পাখীরাই আগাগোড়া সত্য ব'লে, বেচারাদের মিথ্যা ব'ল্‌বার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে,—মেয়েদেরি বিস্তর অলঙ্কার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।"

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজ জা একটা জানালার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক ক'রে ধ'রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "এখানে যে?"—তিনি ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে উত্তর ক'র্‌লেন, "আড়ি পাতছিলুম্‌।"

যখন ফিরে এলুম্‌, সন্দীপবাবু করুণ স্বরে ব'ল্‌লেন, "আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হ'লো না।"

শুনে আমার ভারি লজ্জা হ'লো। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতোটা সময় দেওয়া উচিত ছিলো তা দেওয়া হয়নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব ক'র্‌লে সেটা বুঝ্‌তে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব ক'র্‌ছিলো তা আমার মনেও হয়নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখ্‌তে পেলেন—সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি ব'ল্‌লেন, "বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিলো তবুও যে এতো কষ্ট ক'রে সত্য রক্ষা ক'র্‌লেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।"

আমি ভালো ক'রে জবাব দিতে পারিনি; মুখ লাল ক'রে ঘেমে একটা সোফার কোণে ব'সে প'ড়্‌লুম্‌। দেশের মূর্ত্তিমতী নারীশক্তির মতো যে রকম নিঃসঙ্কোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাবো কল্পনা ক'রেছিলুম্‌ এ পর্য্যন্ত তার কিছুই হ'লো না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা ক'রেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্‌ ঝক্‌ ক'রে উঠ্‌তে থাকে। এর পরেও আমি বরাবর দেখেছি আমি উপস্থিত থাক্‌লেই তিনি তর্ক ক'র্‌বার সামান্য উপলক্ষ্যটুকু ছাড়্‌তেন না।

'বন্দেমাতরম্‌' মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কি তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ ক'রে ব'ল্‌লেন, "দেশের কাজে

মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মানোনা নিখিল ?”

একটা জায়গা আছে মানি কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ-জিনিষকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জান্‌তে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই—এতো বড়ো জিনিষের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার যাদুমন্ত্র ব্যবহার ক'র্‌তে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র ব'ল্‌চো আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা ব'লে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক—মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেম্‌নি দেশের মধ্যে।

একথা যদি সত্যই বিশ্বাস করো তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা ক'র্‌তে নিষেধ করিনে কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ক'রে সে পূজা কেমন ক'রে সমাধা হবে ?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই ক'রেই অর্জ্জুন বরলাভ ক'রেছিলেন। আমরা একদিক দিয়ে ভগবানকে মার্‌বো একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয়, তবে যারা দেশের ক্ষতি ক'রচে আর যারা

দেশের সেবা ক'র্‌চে উভয়েই তাঁর উপাসনা ক'র্‌চে—তাহ'লে বিশেষ ক'রে দেশভক্তি প্রচার ক'র্‌বার দরকার নেই!

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা—ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উদ্দীপনা আছে।

তাহ'লে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ বিদেশে সব চেয়ে বড়ো ক'রে কানে বাজ্‌চে!

নিখিল, তুমি যে এই সব তর্ক ক'র্‌চো এ কেবল বুদ্ধির শুক্‌নো তর্ক। হৃদয় ব'লে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মান্‌বে না?

আমি তোমাকে সত্য ব'ল্‌চি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্ত্তব্য, অধর্ম্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে ব'লেই আমি স্থির থাক্‌তে পারিনে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি, তাহ'লে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিইনে? চুরি ক'র্‌তে পারিনে যে, সে কি বুদ্ধি আছে ব'লে? না, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ব'লে?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হ'চ্ছিলো আমি আর থাক্‌তে পার্‌লুম্ না। আমি ব'লে উঠ্‌লুম্,—"ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?"

সে চুরির জবাবদিহি তাদের ক'র্‌তে হবে, এখনো ক'র্‌তে হ'চ্চে! ইতিহাস এখনো শেষ হ'য়ে যায়নি।

সন্দীপবাবু ব'ল্‌লেন, "বেশ তো আমরাও তাই ক'র্‌বো। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই ক'রে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধ'রে আমরাও জবাবদিহি ক'র্‌বো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি যে ব'ল্‌লে এখনো তারা জবাবদিহি ক'রচে সেটা কোথায়?"

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি ক'র্‌ছিলো তখন তা কেউ দেখ্‌তে পায়নি। তখন তার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিলো না। বড়ো বড়ো ডাকাত সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিষ কি দেখ্‌তে পাচ্চ না—ওদের পলিটিক্সের ঝুলিভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেষ্টিজ্‌ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে সব পাপের বোঝা নিয়ে চ'লেছে এর ভার কি কম? আর এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্চে না? দেশের উপরেও যারা ধর্ম্মকে মান্‌চে না, আমি ব'ল্‌চি তারা দেশকেও মান্‌চে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তে শুনিনি—আমার সঙ্গে তিনি তর্ক ক'রেচেন কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হ'তো। আজ দেখ্‌লুম্‌ তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিলো না। কেবলি মনে হ'চ্ছিলো, এর উপযুক্ত উত্তর

আছে, উপস্থিতমতো সে আমার মনে জোগাচ্ছিলো না। মুস্কিল এই যে ধর্ম্মের দোহাই দিলে চুপ্ ক'রে যেতে হয়—একথা বলা শক্ত ধর্ম্মকে অতোটা দূর পর্য্যন্ত মান্‌তে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালো রকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখ্‌বো এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেবো আমার মনে এই সঙ্কল্প ছিলো। তাই আজকের কথাবার্ত্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট ক'রে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লেন, "আপনি কি বলেন?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাইনে, আমি মোটা কথাই ব'ল্‌বো। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ ক'র্‌বো—আমি কিছু চাই যা আমি কাড়্‌বো কুড়বো; আমার রাগ আছে আমি দেশের জন্যে রাগ ক'র্‌বো, আমি কাউকে চাই যাকে কাট্‌বো কুট্‌বো, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুল্‌বো; আমার মোহ আছে আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হবো, আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা ব'ল্‌বো, দেবী ব'ল্‌বো, দুর্গা ব'ল্‌বো; যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেবো। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।"

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন, "হুরা, হুরা!"—পরক্ষণেই সংশোধন ক'রে ব'ল্‌লেন, "বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং!"

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চ'লে গেলো। তিনি খুব মৃদুস্বরে ব'ল্‌লেন, "আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই ব'ল্‌চি, আমার যা কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেবো না, দেবো না, দেবো না।"

সন্দীপবাবু ব'ল্‌লেন, "দেখো নিখিল, সত্য জিনিষটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হ'য়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধ'রে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হ'তে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্ম্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্ব্বল ক'রে দেয়; মেয়েরা সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে; মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় ক'র্‌তে পারে, সে অন্যায় ভয়ঙ্কর সুন্দর, পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়-বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে ব'লে রাখ্‌চি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্ব্বিচার নির্ব্বিকার হ'য়ে নিষ্ঠুর হ'তে হবে, অন্যায় ক'র্‌তে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ ক'রে নিতে হবে। আমাদের কবি কি ব'লেচে মনে নেই?—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী !
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক্ সঞ্চরি !
অকল্যাণের বাজুক্ শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক
বুকে দাও, প্রলয়ঙ্করী !

আজ ধিক্ সেই ধর্ম্মকে যা হাস্‌তে হাস্‌তে সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে জানে না !

এই ব'লে তিনি মেজের উপর দু'বার জোরে লাথি মার্‌লেন—কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধূলো চ'ম্‌কে উপরে উঠে প'ড়্‌লো। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো ব'লে মেনেছে একমুহূর্ত্তে তিনি তাকে অপমান ক'রে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো।

আবার হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌লেন, "যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জ্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো !"

এই শেষ ক'টি কথা তিনি যে কা'কে ব'ল্‌লেন তা ঠিক বোঝা গেলো না। মনে করা যেতে পার্‌তো, তিনি যাকে বন্দেমাতরং ব'লে বন্দনা করেন তাকে, কিম্বা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্ত্তমান ছিলো

তাকে। মনে করা যেতে পারতো কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ ক'রেছিলেন, তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ ব'লে উঠলেন, কিম্বা জনসাধারণের মনোহরণ ব্যবসায়ে চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় ব'লতেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ব'ললেন, "সন্দীপ, চন্দ্রনাথ বাবু এসেচেন।"

হঠাৎ চমক্ ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুক্‌বেন কি না ভাব্‌চেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্য্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে ব'ললেন, "ইনি আমার মাষ্টার মশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে ব'লেছি, এঁকে প্রণাম করো।"

আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রলুম্। তিনি আশীর্ব্বাদ ক'রলেন, "মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।"

ঠিক্ সেই সময়ে আমার সেই আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন ছিলো।

নিখিলেশের আত্মকথা

৫

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিলো ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারবো। এ পর্য্যন্ত তার পরীক্ষা হয়নি। এবার বুঝি সময় এলো।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই ক'রতুম্ অনেক দুঃখ কল্পনা ক'রেচি। কখনো ভেবেচি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান কখনো মৃত্যু। এমন কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেচি। এ সমস্তই নমস্কার ক'রে মাথায় ক'রে নেবো এ কথা যখন বলেছি বোধ হয় মিথ্যা বলিনি।

কেবল একটা কথা কোনো দিন মনে কল্পনাও করতে পারিনি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন ব'সে ব'সে ভাবচি, এও কি সইবে?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েচে। কাজকর্ম্ম করচি কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে। কি? এ কি? কি হ'য়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণ চাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এলো?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ প'রে লুকিয়ে ব'সেছিলো তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়্‌চে, আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এলো ব'লে, সে যতোই প্রাণপণে ঘোম্‌টা টান্‌চে আমার হৃদয়ের সাম্‌নে ততোই তার আব্রু ঘুচে গেলো। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েচে—যা দেখ্‌বার নয়, যা দেখ্‌তে চাইনে তাও ব'সে ব'সে দেখ্‌চি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্য্যের ফাঁকির মধ্যে এতো বড়ো কাঙাল হ'য়ে ব'সেছিলুম্ সে কথা এতোকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল ক'রে প্রকাশ কর্‌বার দিন এলো কেন? যৌবনের এই ন'টা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েচি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় ক'র্‌তে থাক্‌বে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোলো সবচেয়ে বড় ঋণশোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে ব'ল্‌তে পারি, হে সত্য তোমারি জয় হোক্।

আমার পিস্‌তুত বোন্ মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসে-ছিলো তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাব্‌ছিলো আমার মতো সুখী জগতে কেউ নেই। আমি ব'ল্‌লুম্, "গোপাল,

মুন্নুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাবো।” মুন্নু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরীবের ঘরটিকে স্বর্গ ক’রে রেখেচে। সেই লক্ষ্মীর হাতের অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদ্‌চে তার ঘরের অভাবগুলিই তার ভূষণ হ’য়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসিগে।—ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধূলো আজো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

জোর ক’রে অহঙ্কার ক’রে কি ক’র্‌বো? না হয় মাথা হেঁট ক’রেই ব’ল্‌লুম্ আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই। কিন্তু জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এই রকম অসঙ্কোচে পায়ের তলায়—কিন্তু এ সমস্ত তর্ক করা কেন? ঝগড়া ক’রে তো যোগ্যতা লাভ করা যায় না! অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! না হয় তাই হ’লো—কিন্তু ভালোবাসার তো মূল্য চাই—সে যে অযোগ্যতাকেও সফল ক’রে তোলে। যোগ্যের জন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে—অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে ব’লেছিলুম্ তোমাকে বাইরে আস্‌তে হবে। বিমল ছিলো আমার ঘরের মধ্যে—সে ছিলো ঘরগড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্ত্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম্ সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না

সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম্ তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিলো আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেই জন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিষ চাইনি—আমি তাকেই চেয়েছিলুম্ আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনো মতেই ধরা যায় না। স্মৃতি সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমলকে দেখ্‌বার বড়ো ইচ্ছা ছিলো।

একটা কথা তখন ভাবিনি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্ত-রূপে সত্যরূপেই দেখ্‌তে চাই তাহ'লে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখ্‌বার আশা ছেড়ে দিতে হয়। একথা কেন ভাবিনি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহঙ্কারে?—না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিলো ব'লেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য ক'র্‌বার শক্তি আমার আছে এই অহঙ্কার আমার মনে ছিলো। আজ তার পরীক্ষা হ'চ্চে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো এই অহঙ্কার এখনো মনে রেখে দিলুম্।

আজ পর্য্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝ্‌তে পারেনি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্ব্বলতা ব'লেই জানি। যে দুর্ব্বল সে সুবিচার ক'র্‌তে সাহস করে না;—ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি

ফল পেতে চায়। ধৈর্য্যের পরে বিমলের ধৈর্য্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দ্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি, অন্যায়কারীকে দেখ্‌তে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুন্‌ বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো ক'রে দেখ্‌বে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ দেখ্‌তে পাচ্চি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন ক'রে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে তুল্‌তে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেম্‌নি আমার পণ এই যে কোনো একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগ্‌বো না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকরবাকরকে মারধোর ক'র্‌তে পারিনে, কারো উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু একটা ব'ল্‌তে বা ক'র্‌তে আমার সমস্ত দেহমনের ভিতর একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। আমি জানি আমার এই সঙ্কোচকে মৃদুতা ব'লে বিমল মনে মনে অশ্রদ্ধা করে—আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ ক'রে উঠ্‌চে যখন দেখ্‌চে আমি 'বন্দেমাতরম্‌' হেঁকে চারিদিকে যা-ইচ্ছে-তাই ক'রে বেড়াইনে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি

যে ব'সে যাইনি এতে সকলেরই অপ্রিয় হ'য়েচি। দেশের লোক ভাব্‌চে আমি খেতাব চাই কিংবা পুলিসকে ভয় করি; পুলিস ভাব্‌চে ভিতরে আমার কুমৎলব আছে ব'লেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চ'লেচি।

কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ ব'লেই জেনে, মানুষকে মানুষ ব'লেই শ্রদ্ধা ক'রে, যারা তার সেবা ক'র্‌তে উৎসাহ পায় না, চীৎকার ক'রে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র প'ড়ে—যাদের কেবলি সম্মোহনের দরকার হয় তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল ক'রে রাখ্‌বার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত ক'রে দিলেই আমরা আর বল পাইনে। হয় কোনো কল্পনাকে, নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার ক'রে না বসালে সে ন'ড়্‌তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাইনে, যতক্ষণ এই রকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝ্‌তে হবে স্বাধীন ভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয়নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেম্‌নি হোক্‌, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত, নয় কোনো সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে, আমাদের উপর উৎপাত ক'র্‌বেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে ব'ল্‌লে "তোমার অন্য নানা গুণ

থাক্‌তে পারে কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই ;—সেই জন্যেই স্বদেশের এই দিব্যমূর্ত্তিকে তুমি সত্য ক'রে দেখ্‌তে পার না।” দেখ্‌লুম্ বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর ক'র্‌লুম্ না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেন না এ তো বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোটো ঘরকন্নার সীমা-টুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোটো আকারেই দেখা দেয় সেই জন্যে সেটুকুতে মিলনগানের তাল কেটে যায় না। বড় সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়—সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কল-ধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই ? অর্থাৎ আমার মনের প্রদীপে তেল-বাতি থাক্‌তে পারে কেবল শিখার অভাব! আমি তো বলি সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চক্‌মকি পাথরের মতো আলোকহীন, তাই এতো ঠুক্‌তে হয় এতো শব্দ ক'র্‌তে হয় তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরয়—সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহঙ্কার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য ক'রেচি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ব'লেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড় নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারী।

টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্ব্বে আমাকে অনেকবার ব'লেচে। আমি যে তা বুঝিনি তা নয় কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা ক'র্‌তে পার্‌তুম্‌ না। ওযে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে একথা মনে ক'র্‌তেও আমার লজ্জা হ'তো। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য ক'র্‌চি সেটা পাছে কুশ্রী হ'য়ে দেখা দেয় এই জন্যে ও সম্বন্ধে আমি কোনো রকম তক্‌রার ক'র্‌তে চাইতুম্‌ না। আজ কিন্তু বিমলকে একথা বোঝান শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা ক'র্‌চে, তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু ব'ল্‌তে আমার মন ছোটো হ'য়ে যায়, কি জানি হয় তো তার মধ্যে মনের ঈর্ষ্যা এসে বেঁধে, হয় তো অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগ্‌চে তার রেখা হয় তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েচে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাষ্টার মশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম্‌ তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেচি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌তো না—কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্ত্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে

তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা ক'রেচেন—তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য ক'রে এমন প্রত্যক্ষ ক'রে পেয়েচি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে ব'ল্‌লেন, "সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?"

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়, তিনি কেমন ক'রে বুঝ্‌তে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না কিন্তু সেদিন সাম্‌নে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কতো ভালো-বাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে ব'ল্‌লুম্, "তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েচি তারা ভেবেচে আমিই তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেচি।"

বিমল চা-দানি থেকে চা ঢাল্‌ছিলো। একমুহূর্ত্তে তার মুখ শুকিয়ে গেলো। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "আমরা এই যে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার ক'রে বেড়াচ্চি, ভেবে দেখ্‌লুম্ এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হ'চ্চে। আমার মনে হয় এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র ক'রে যদি আমরা কাজ করি তা হ'লে ঢের বেশী স্থায়ী কাজ হ'তে পারে।"

এই ব'লে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "আপনার কি তাই মনে হয় না?"

বিমল কি উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলে না। একটু

পরে ব'ল্‌লে, "দু'রকমেই দেশের কাজ হ'তে পারে। চারিদিকে ঘুরে কাজ করা কিম্বা এক জায়গায় ব'সে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিম্বা স্বভাব অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যে ভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "তবে সত্য কথা বলি। এতোদিন বিশ্বাস ছিলো ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম্। ভুল বোঝ্‌বার একটা কারণ ছিলো এই যে আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখ্‌তে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাইনি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত ক'রে সেই উত্তেজনা থেকেই 'আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ ক'র্‌তে হ'তো। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন তো আজ পর্য্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখিনি। ধিক্ এতো দিন আপন শক্তির অভিমান ক'রেছিলুম্। দেশের নায়ক হ'বার গর্ব্ব আর রাখিনে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র হ'য়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুল্‌তে পার্‌বো এ আমি স্পর্দ্ধা ক'রে ব'ল্‌তে পারি। না, না, আপনি লজ্জা ক'র্‌বেন না—মিথ্যা লজ্জা সঙ্কোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষিরাণী—আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ ক'র্‌বো—কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার

থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢাল্‌তে তার হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

চন্দ্রনাথবাবু আর একদিন এসে ব'ল্‌লেন, "তোমরা দু'জনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাও—তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি ?"

বিমলকে সন্ধ্যার সময় ব'ল্‌লুম্, "বিমল দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে যাবে ?"

আমি জানি দার্জ্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্ব্বত দেখ্‌বার জন্যে বিমলের খুব সখ ছিলো। সেদিন সে ব'ল্‌লে, "না, এখন থাক্ !"

দেশের ক্ষতি হ'বার আশঙ্কা ছিলো।

আমি বিশ্বাস হারাবো না, আমি অপেক্ষা ক'র্‌বো! ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা ;—ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে ব'সে ছিলো, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলচ্চে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হ'য়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হ'য়ে যাবে তখন দেখবো আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই

বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাইনে তাহ'লে বুঝ্‌বো এতোদিন যা নিয়েছিলুম্ সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে তো ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বো না, আস্তে আস্তে বিদায় হ'য়ে যাবো। জোর জবরদস্তি? কিসের জন্যে? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে?

সন্দীপের আত্মকথা

৬

যেটুকু আমার ভাগে এসে প'ড়েচে সেইটুকুই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্ব্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পা'র সেইটেই যথার্থ আমার, এই হ'লো সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি ব'লেই দেশ আমার নয়—দেশকে যেদিন লুঠ ক'রে নিয়ে জোর ক'রে আমার ক'র্‌তে পার্‌বো সেই দিনই দেশ আমার হবে।

লাভ ক'র্‌বার স্বাভাবিক অধিকার আছে ব'লেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হবো প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্চে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মান্‌তে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এই জন্যেই নীতিকে আজপর্য্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠ্‌তে পার্‌চে না।

যারা কাড়্‌তে জানে না, ধ'র্‌তে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আল্‌গা হ'য়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধ-মরা একদল লোক আছে. নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক্। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে

ভোগ ক'র্‌তে জানে, যাদের দ্বিধা নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র! তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেচে। তারাই নদী সাঁৎরে আস্‌বে, পাঁচিল ডিঙিয়ে প'ড়্‌বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙ্‌বে, পাবার যোগ্য জিনিষ ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চ'লে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ এতেই দামী জিনেষের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ ক'র্‌বে,—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ ক'র্‌তে ভালোবাসে—তাই আধ-মরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্ত-ফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবৎখানায় রসনচৌকি বাজ্‌চে—লগ্ন ব'য়ে যায় যে, মন উদাস হ'য়ে গেলো। বর কে? যে মশাল জ্বালিয়ে এসে প'ড়্‌তে পারে, বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা? না, আমি লজ্জা করিনে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা ক'রে যারা নেবার যোগ্য জিনিষ নিলে না, তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হ'চ্চে রিয়ালিটির পৃথিবী—কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি পেটে খালি হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চ'লে গেলো, সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিলো? আস্‌মানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা-তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্ম্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে

তারা বায়না নিয়েছিলো না কি ? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভ'র্‌বে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে ক'রে চট্‌কাবো, দুই পায়ে ক'রে দ'ল্‌বো, সমস্ত গায়ে তা মাখ্‌বো, সমস্ত পেট ভ'রে তা খাবো। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাৎলা সাদা হ'য়ে গেছে তাদের চীঁচীঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।

লুকোচুরি ক'র্‌তে আমি চাইনে কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে কিন্তু দরকার হ'লে যদি ক'র্‌তে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখ্‌তে চাও; সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁদ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেয়াল গাঁথ, আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁদ কাটি। তুমি যদি কল করো, আমি কৌশল ক'র্‌বো। এইগুলোই হ'চ্চে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ড কারখানা চ'ল্‌চে। আর যে সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেইজন্যে এতো চীৎকারে সে সব কথা কেবলমাত্র দুর্ব্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়; যারা সবল হ'য়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে সব কথা মান্‌তে পারে না। কেননা মানতে গেলেই বলক্ষয় হয়; তার কারণ

কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝ্‌তে দ্বিধা করে না, মান্‌তে লজ্জা করে না তারাই কৃতকার্য্য হ'লো, আর যে হতভাগা একদিকে প্রকৃতি আরেক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু'-নৌকায় পা দিয়ে দুলে ম'র্‌চে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচ্‌তে!

একদল মানুষ বাঁচ্‌বে না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্য্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব,—ওকে নির্জ্জীব ব'ল্লেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হ'য়ে গেছে। ও আমাকে বলে, "জোর না হ'লে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি, কিন্তু কাকে জোর বলো, আর কোন্ দিকে পেতে হ'বে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একে-বারে মরিয়া হ'য়ে উঠেচো।"

নিখিলেশ ব'ল্‌লে, "হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখী যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান ক'র্‌বার জন্যে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিষ বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো—তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।"

নিখিলেশ এই রকম রূপক দিয়ে কথা কয়, তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবল মাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এই রকম রূপক নিয়েই

সুখে থাকে তো থাক্—আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব, আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে, আমরা দৌড়তে পারি, ধ'র্‌তে পারি, ছিঁড়্‌তে পারি,—আমরা সকাল বেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারিনে; অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগ্‌লে থাক্‌লে আমরা পার্‌বো না। হয় চুরি ক'র্‌বো, নয় ডাকাতি ক'র্‌বো। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচ্‌বে না,—আমরা তো মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে রাজী নই—তা এতে আমাদের বৈষ্ণব বাবাজিরা যতোই দুঃখিত হোন্ না কেন!

আমার এই কথাগুলোকে সবাই ব'ল্‌বে,—ও তোমার একটা মত। তার কারণ পৃথিবীতে যারা চ'ল্‌চে তারা এই নিয়মেই চ'ল্‌চে, অথচ ব'ল্‌চে অন্য রকম কথা। এই জন্যে তারা জানেনা এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয় জীবনে তার একটা পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় ক'র্‌তে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চ'ড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার দেহে মনে কথায় ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখ্‌তে পায়—সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপূর—

ইচ্ছা চাই-চাই খাই-খাই ক'র্‌তে ক'র্‌তে কোটালের বানের মতো গর্জ্জে চ'লেচে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে, এই দুর্দ্দম ইচ্ছাই হ'চ্চে প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মান্‌তে চায় না ব'লেই চারিদিকে জয়ী হ'চ্চে। বারবার দেখ্‌লুম্‌ আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েচে, তারা ম'র্‌বে কি বাঁচ্‌বে তার আর হুঁস্‌ থাকেনি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হ'চ্চে বীরের শক্তি—অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর কোনো জগৎ পাবার আছে ব'লে কল্পনা করে, তারা তাদের ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আস্‌মানের দিকেই নিয়ে যাক্‌—দেখি তাদের সেই ফোয়ারা কতোদূর ওঠে, আর কতো দিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয়নি।

"এফিনিটি!" জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষ-ভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি, এমন কথা সময়মতো দরকারমতো অনেক জায়গায় ব'লেচি। তার কারণ, মানুষ মান্‌তে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এই জন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভ'রে গেলো! এফিনিটি একটা কেন? এফিনিটি হাজারটা। একটা এফিনিটির খাতিরে আর সমস্ত এফিনিটিকে বরখাস্ত ক'রে ব'সে থাক্‌তে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক এফিনিটি পেয়েছি—

তাতে ক'রে আরো একটি পাবার পথ বন্ধ হয়নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি—সেও আমার এফিনিটি দেখ্‌তে পেয়েচে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় ক'র্‌তে না পারি তাহ'লে আমি কাপুরুষ!

বিমলার আত্মকথা

৭

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিলো তাই ভাবি। নিজেকে দেখ্‌বার আমি একটুও সময় পাইনি—আমার দিন-গুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘূর্ণার মতো ঘুর্‌ছিলো। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌বার একটুও ফাঁক পায়নি।

একদিন আমার সাম্‌নেই আমার মেজ জা হাস্‌তে হাস্‌তে আমার স্বামীকে ব'ল্‌লেন, "ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়ীতে এতোদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেচে, এইবার পুরুষদের পালা এলো, এখন থেকে আমরা কাঁদাবো। কি বলো ভাই ছোটরাণী? রণবেশ তো প'রেচো, রণরঙ্গিনী, এবার পুরুষের বুকে ক'সে হানো শেল।"

এই ব'লে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোক বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে সজ্জায়, ভাবে গতিতে ভিতরের দিক থেকে একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠ্‌ছিলো, তার লেশমাত্র মেজ জায়ের চোক এড়াতে পারেনি। আজ আমার একথা লিখ্‌তে লজ্জা হ'চ্চে কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিলো না। কেননা সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ ক'র্‌ছিলো, কিছুই বুঝে সুঝে করিনি।

আমি জানি সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ ক'র্তুম্। কিন্তু সে যেন অন্যমনে। আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভাল লাগ্তো তা আমি স্পষ্ট বুঝ্তে পার্তুম্। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝ্বার দরকার ছিলো না। সন্দীপবাবু সকলের সাম্নেই তার আলোচনা ক'র্তেন। তিনি আমার সাম্নে আমার স্বামীকে একদিন ব'ল্লেন, "নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষিরাণীকে আমি প্রথম দেখ্লুম্ —সেই জরীর-পাড়-দেওয়া কাপড় প'রে চুপ ক'রে ব'সে, চোক দু'টো যেন পথ-হারানো তারার মতো অসীমের দিকে তাকিয়ে—যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধ'রে এই রকম ক'রে তাকিয়ে,—তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠ্লো— মনে হ'লো ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন বাহিরে কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে জড়িয়ে র'য়েছে। এই আগুনই তো চাই—এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষিরাণী, আমার এই একটি অনুরোধ রাখ্বেন, আরেকদিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।"

এতদিন আমি ছিলুম্ গ্রামের একটী ছোটো নদী—তখন ছিলো আমার এক ছন্দ, এক ভাষা—কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেলো—আমার বুক ফুলে উঠ্লো, আমার কূল ছাপিয়ে গেলো, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠ্তে লাগ্লো; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার

সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌ না। সে আমি কোথায় গেলো? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন ক'রে ফেনিয়ে এলো? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্য্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠ্‌লো। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজ্‌তে লাগ্‌লো। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন ক'রে সৃষ্টি ক'র্‌লেন্‌? তাঁর এতোদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন? যে সুন্দরী ছিলো না সে সুন্দরী হ'য়ে উঠ্‌লো। যে ছিলো সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব ক'র্‌লে। সন্দীপবাবুর তো কেবল একটি মাত্র মানুষ নন—তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্ত-ধারার মোহানার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে ব'ল্‌লেন, মৌচাকের মক্ষিরাণী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশ-সেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হ'য়ে গেলো। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড়ো জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা, আর আমার মেজ জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ ক'র্‌তেই পার্‌লে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সেকথা আমার বিশ্বাস

ক'র্‌তে বাধেনি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেচে—সে এমন একটা কিছু, যাকে ইতিপূর্ব্বে আমি অনুভব করিনি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এলো, এ জিনিষটা কি, সে নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ওঠ্‌বার সময় ছিলো না ;—এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়, এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোট বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সঙ্কোচ বোধ হ'তো কিন্তু সেটা অল্প সময়ে কেটে গেলো আমি যা ব'ল্‌তুম্ তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতেন। তিনি কেবলি ব'ল্‌তেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাব্‌তেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝ্‌তে পারেন, আপনাদের আর ভাব্‌তে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি ক'রেচেন আর পুরুষদের তিনি হাতে ক'রে হাতুড়ি পিটিয়ে গ'ড়েচেন। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার বিশ্বাস হ'য়েছিলো আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি, সহজ শক্তি এতোই সহজ যে আমি নিজেই এতোদিন তাকে দেখ্‌তে পাইনি।

দেশের চারিদিক্ থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আস্‌তো, সে সমস্তই আমি প'ড়্‌তুম্, এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেতো না। মাঝে

মাঝে এক একদিন সন্দীপবাবু আমার সঙ্গে মতে মিল্‌তেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তুম্ না। কিন্তু তার দু'দিন পরেই সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখ্‌তে পেতেন এবং তখনি আমাকে ডাকিয়ে এনে ব'ল্‌তেন, "দেখুন সেদিন আপনি যা ব'লেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল।"—এক একদিন ব'ল্‌তেন, "আপনার যে পরামর্শটি নিইনি সেইটেতেই আমি ঠ'কেচি। আচ্ছা এর রহস্যটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?"

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হ'তে লাগ্‌লো যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা কিছু কাজ চ'ল্‌ছিলো তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিলো একজন সামান্য স্ত্রী-লোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভ'রে রইলো।

আমাদের এই সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিলো না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে অথচ কাজে কর্ম্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না, সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেই রকম ভাবটা প্রকাশ ক'র্‌তেন। আমার স্বামী যে এ সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো, তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে উল্টো রকম, এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌তেন। আমার স্বামীর এই সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে যেন সেই জন্যেই সন্দীপবাবু তাঁকে

আরো বেশি ক'রে ভালোবাস্‌তেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় ক'র্‌বার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা প'ড়্‌তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জান্‌তে পারে না—অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘ'টে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চ'ল্‌ছিলো তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো যে আমি টেরই পেলুম্ না কতো বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘ'ট্‌চে। এই বুঝি মেয়েদেরি স্বভাব—তাদের হৃদয়াবেগ যখন একদিকে প্রবল হ'য়ে জেগে ওঠে তখন অন্যদিকে তাদের আর কিছুই সাড় থাকে না। এই জন্যেই আমরা প্রলয়ঙ্করী; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো, কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই, তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেলো।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচর জাতীয় পদার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিলো, ভিতরের থেকে মক্ষির বাধা ছিলো না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে র'য়ে-ব'সে ভোগ ক'র্‌তুম্ তাহ'লে হয় তো লোকের একরকম সয়ে যেতো। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনি জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা ঘরে আমাদের সভাটা এম্‌নি জোরে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো যে, আর কোনো কথা মনেই রইলো না।

বৈঠকখানা ঘরে যখন মক্ষি আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম ক'রে টের পাই। খানিকটা বালা-চুড়ির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে, সেটা টেনে খুল্‌তে গেলে যথেষ্ট শব্দ হ'য়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন ক'রে মক্ষি শেল্‌ফ্ থেকে

মনের মতো বই বাছাই ক'র্‌তে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য ক'র্‌বার প্রস্তাব ক'র্‌তেই সে চ'ম্‌কে উঠে আপত্তি করে—তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্ব্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য ক'রেই ঘর থেকে রওনা হ'য়েছিলুম্। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই আমি চ'লেছিলুম্—এমন সময় সে পথ আগ্‌লে ব'ল্‌লে, "বাবু, ওদিকে যাবেন না।"

যাবো না ? কেন ?

বৈঠকখানা ঘরে রাণীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রাণীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা ক'র্‌তে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হ'লো, গলা একটু চ'ড়িয়ে ব'ল্‌লুম্,—"আমি হুকুম ক'র্‌চি তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।"

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থম্‌কে গেলো। তখন আমি তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগোলুম্। যখন প্রায় দরজার কাছ বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌বার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধ'রে ব'ল্‌লে, "বাবু, যাবেন না।"

কি ? আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম্। এমন সময়ে মক্ষি

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান ক'র্‌বার উপক্রম ক'র্‌চে।

তার সেই মূর্ত্তি আমি কখনো ভুল্‌বো না। মক্ষি যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিকে তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন্, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দা ক'রে বলে "ঢ্যাঙা"। ওর ঐ লম্বা গড়ন্‌টিই আমাকে মুগ্ধ করে—যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা—সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়-গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেচে। ওর রং শাম্‌লা—কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শাম্‌লা—কি তেজ আর কি ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্‌লো। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জ্জনী তুলে রাণী ব'ল্‌লে, "নন্‌কু, চলা যাও!—"

আমি ব'ল্‌লুম্, "আপনি রাগ ক'র্‌বেন না—নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চ'লে যাচ্চি!"

মক্ষি কম্পিত স্বরে ব'ল্‌লে. "না আপনি যাবেন না—ঘরে আসুন।"

এ তো অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে ব'সে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগ্‌লুম্। মক্ষি একটা কাগজের টুক্‌রোয় পেন্সিল দিয়ে কি লিখে বেহারাকে ডেকে ব'ল্‌লে, "বাবুকে দিয়ে এসো।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "আমাকে মাপ ক'র্‌বেন, ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারিনি—দরোয়ানটাকে মেরেচি।"

মক্ষি ব'ল্‌লে, "বেশ ক'রেচেন।"

কিন্তু ও বেচারার তো কোনো দোষ নেই—ও তো কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌চে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুক্‌লো। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ ক'রে জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম্‌।

মক্ষি নিখিলকে ব'ল্‌লে, "আজ নন্‌কু দরোয়ান সন্দীপ-বাবুকে অপমান ক'রেচে।"

নিখিল এম্‌নি ভালোমানুষের মতো আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লে, "কেন ?" যে আমি আর থাক্‌তে পার্‌লুম্‌ না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম্‌। ভাব্‌লুম্‌, সাধু-লোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষি ব'ল্‌লে, "সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আস্‌ছিলেন্‌ সে ওঁর পথ আটক্‌ ক'রে ব'ল্‌লে, হুকুম নেই।"

নিখিল জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "কার হুকুম নেই ?"

মক্ষি ব'ল্‌লে, "তা কেমন ক'রে ব'ল্‌বো ?"

রাগে ক্ষোভে মক্ষির চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর কি!

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে ব'ল্‌লে, "হুজুর, আমার তো কসুর নেই। হুকুম তামিল ক'রেছি।"

কার হুকুম ?

বড়ো রাণীমা মেজো রাণীমা আমাকে ডেকে ব'লে দিয়েচেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ ক'রে রইলুম্।

দরোয়ান চ'লে গেলে মক্ষি ব'ল্লে, "নন্কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।"

নিখিল চুপ ক'রেই রইলো। আমি বুঝ্লুম্ ওর ন্যায়-বুদ্ধিতে খট্কা লাগ্লো। ওর খট্কার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড়ো শক্ত সমস্যা! সোজা মেয়ে তো নয়। নন্কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ্ ক'রেই রইলো। তখন মক্ষির চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে প'ড়্তে লাগ্লো। নিখিলের ভালোমানুষির পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইলো না।

নিখিল কোনো কথা না ব'লে উঠে ঘর থেকে চ'লে গেলো।

পরদিন সেই দরোয়ানকে দেখা গেলো না। খবর নিয়ে শুন্লুম্, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত ক'রে পাঠিয়েচে—দরোয়ানজির তাতে লাভ বই ক্ষতি হয়নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কতো ঝড় ব'য়ে গেছে সে তো আভাসে বুঝ্তে পার্চি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়। নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া!

এর ফল হ'লো এই যে এর পরে কিছুদিন মক্ষি রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ ক'র্তে আরম্ভ ক'র্লে—কোনোরকম প্রয়োজনের কিম্বা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্য্যন্ত রাখ্লে না।

এমনি ক'রেই ভাবভঙ্গী ক্রমে আকার ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে স্পষ্টতায় জমে উঠ্‌তে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্র-লোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই।

এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায়-হাওয়ায় সংস্কারের পর্দ্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছন,—সত্যের এ এক আশ্চর্য্য জয়যাত্রা।

সত্য নয় তো কি! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হ'লো একটা বাস্তব জিনিষ; ধূলোর কণা থেকে আরম্ভ ক'রে আকাশের তারা পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখ্‌তে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধি-নিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিষ ক'রে বানাতে ব'সেচে। যেন সৌর-জগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন্ ক'র্‌বার ফর্‌মাস্। তারপরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্ত্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্মবল, বিশ্বাসবল—কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে? তখন কতো ধিক্কার, কতো হাহাকার, কতো শাসন—কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বে কি শুধু মুখের কথায়? সে তো জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়, সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সাম্‌নে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখ্‌তে আমার ভারি চমৎকার লাগ্‌চে। কতো লজ্জা, কতো ভয়, কতো দ্বিধা,—তাই যদি না থাক্‌বে তবে সত্যের রস রইলো কি? এই যে পা কাঁপ্‌তে থাকা, এই যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড়ো মিষ্টি; আর, এই ছলনা, শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে থাক্‌তে, নয় মায়া-আবরণ প'রে বেড়োতে হয়। যে রকম অবস্থা তাতে সে জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ, নির্দ্দয়—যেমন নির্লজ্জ নির্দ্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক্ আর যে মরুক্!

আমি সমস্তই দেখ্‌তে পাচ্চি। ঐ যে পর্দ্দা উড়ে-উড়ে প'ড়্‌চে, ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্চি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজ-সজ্জা চ'ল্‌চে;—ঐ যে লাল ফিতেটুকু ছোট্টো এতোটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ওযে কালবৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা; ঐ যে পাড়ের এতোটুকু ভঙ্গী, ঐ যে জ্যাকেটের এতোটুকু ইঙ্গিত, আমি যে স্পষ্ট অনুভব ক'র্‌চি তার উত্তাপ। অথচ এসব আয়োজন অনেকটা অগোচরে

হ'চ্চে এবং অগোচরে থাক্‌চে, যে ক'র্‌চে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে-দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট ক'রে জান্‌বার এবং মান্‌বার উপায় নিজের হাতে নষ্ট ক'রেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ ক'র্‌তে হয়—এই জন্যে তার গতিবিধি জান্‌তে পারিনে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার ক'র্‌বার জো থাকে না। মানুষ তাকে সয়তান ব'লে বদ্‌নাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েচে, এই জন্যেই সাপের মূর্ত্তি ধ'রে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে-কানে কথা ক'য়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে; তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেল ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌চে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠ্‌চে। যা চাই সে খুব কাছে আস্‌বে, তাকে মোটা ক'রে পাবো, তাকে শক্ত ক'রে ধ'র্‌বো, তাকে কিছুতে ছাড়্‌বো না—মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুর্‌মার হ'য়ে ধূলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়্‌বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডব নৃত্য—তার পরে মরণ বাঁচন, ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ তুচ্ছ তুচ্ছ তুচ্ছ!

আমার মক্ষিরাণী স্বপ্নের ঘোরেই চ'ল্‌চে—সে জানে না কোন্ পথে চ'ল্‌চে। সময় আস্‌বার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ্য করিনে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম্ মক্ষিরাণী আমার মুখের দিকে একরকম ক'রে তাকিয়ে ছিলো, একেবারে ভুলে গিয়েছিলো এই চেয়ে-থাকার অর্থটা কি। আমি হঠাৎ একসময়ে তার চোখের দিকে চোখ তুল্‌তেই তার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি ব'ল্‌লুম্, "আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেছেন। অনেক জিনিষ লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হ'য়ে লজ্জা করিনে তখন আপনি আমার হ'য়ে লজ্জা ক'র্‌বেন না।"

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হ'য়ে উঠে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো "না, না, আপনি—"

আমি ব'ল্‌লুম্, "আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালবাসে—ঐ লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে-পেয়ে আজ আমার এমন দশা হ'য়েছে যে, আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক্ হ'য়ে আমার খাওয়া দেখুন না, আমি কিছু কেয়ার করিনে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ব ক'রে ফেলে দেবো তবে ছাড়্‌বো—এই আমার স্বভাব।"

আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরাজি বই প'ড়্ছিলুম্, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম্। একদিন দুপুর বেলায় আমি কি জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষিরাণী সেই বইটা হাতে ক'রে নিয়ে প'ড়্চে—পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আরেকটা বই চাপা দিয়ে উঠে প'ড়্লো। যে বইটা চাপা দিলো সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি ব'ল্লুম্ দেখুন আপনারা কবিতার বই প'ড়্তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝ্তে পারিনে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের, কেন না, আমরা কেউবা এটর্ণি, কেউবা এঞ্জি-নিয়ার ; আমাদের যদি কবিতা প'ড়্তেই হয় তাহ'লে অর্দ্ধেক-রাত্রে দরজা বন্ধ ক'রে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি ক'রেচেন তিনি যে গীতিকবি,—জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে ব'সে "ললিতলবঙ্গলতা"য় হাত পাকিয়েচেন।

মক্ষিরাণী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে চ'লে যাবার উদ্যোগ ক'র্তেই আমি ব'ল্লুম্, "না, সে হবেনা,—আপনি ব'সে ব'সে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্চি।"

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম্। ব'ল্লুম্, "ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে প'ড়েনি তাহ'লে আপনি হয়তো আমাকে মারতে আসতেন।"

মক্ষি ব'ল্‌লে, "কেন ?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "কেন না, এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা ক'রেই বলা, কোনো-রকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিলো এ বইটা নিখিল পড়ে।"

একটুখানি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মক্ষি ব'ল্‌লে, "কেন বলুন দেখি ?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "ও যে পুরুষ মানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলি ঝাপ্‌সা ক'রে দেখ্‌তে চায় সেই জন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া বাধে। আপনি তো দেখ্‌চেন সেই জন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকেও লংফেলোর কবিতার মতো ঠাউরেছে—যেন ফি-কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চ'ল্‌তে হবে, এইরকম ওর মৎলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।"

মক্ষি ব'ল্‌লে, "স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কি ?"

আমি ব'ল্‌লুম্ "আপনি প'ড়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। কি স্বদেশ কি অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চ'ল্‌তে চায় তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে ;—কিছুতেই এ কথাটা ও মান্‌তে চায় না যে, কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হ'য়ে গেছে—কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাক্‌বে।"

মক্ষি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তার পরে গম্ভীরভাবে

ব'ল্‌লে, "স্বভাবের চেয়ে বড়ো হ'তে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয় ?"

আমি মনে মনে হাস্‌লুম্‌—ওগো ও রাণী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্‌টস্‌ ক'র্‌চো ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুন্‌ছো, অম্‌নি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে সুরু ক'রেছে—এতোদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে কেন ? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্ব'ল্‌চো আমি কি জানিনে ? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গাম্‌ছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখ্‌বে আর কতোদিন ?

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "পৃথিবীতে দুর্ব্বল লোকের সংখ্যাই বেশি ; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঐ রকমের মন্ত্র দিনরাত পৃথিবীর কানে আউড়ে-আউরে সবল লোকের কান খারাপ ক'রে দিচ্চে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত ক'রে, কাহিল ক'রে রেখেচে, তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল ক'র্‌বার পরামর্শ দেয়।"

মক্ষি ব'ল্‌লে, "আমরা মেয়েরাও দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের ষড়যন্ত্রে আমাদেরও তো যোগ দিতে হবে।"

আমি হেসে ব'ল্‌লুম্‌, "কে ব'ল্‌লে দুর্ব্বল ? পুরুষ মানুষ তোমাদের অবলা ব'লে স্তুতিবাদ ক'রে-ক'রে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্ব্বল ক'রে রেখেছে। আমার বিশ্বাস্‌ তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রেগড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ঙ্করী হ'য়ে

মুক্তি লাভ ক'র্‌বে, এ আমি লিখে প'ড়ে দিচ্চি। বাইরেই পুরুষেরা হাঁক-ডাক ক'রে বেড়ায় কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখ্‌চো, তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্য্যন্ত তারাই তো নিজের হাতে শাস্ত্র গ'ড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়ে জাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এম্‌নি ক'রে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধ্‌বার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাক্‌তো তাহ'লে পুরুষকে আজ ধ'রে রাখ্‌তো কে? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড়ো উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েচে, নানা সাজে সাজিয়েচে, নানা নামে পূজো দিয়েচে। কিন্তু মেয়েরা? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েচো, বাস্তবকে জন্ম দিয়েচো, বাস্তবকে পালন করেচো।"

মক্ষি শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক ক'র্‌তে ছাড়ে না,—সে ব'ল্‌লে, "তাই যদি সত্যি হ'তো তাহ'লে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ ক'র্‌তে পার্‌তো?"

আমি ব'ল্‌লুম্‌,"মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে—তারা জানে পুরুষ জাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে সেই জন্যে তারা পুরুষের কাছ থেকেই কথা ধার ক'রে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষ জাতটার ঝোঁক বেশি, এই জন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে-ভঙ্গিতে তারা নিজেকে মদ ব'লেই চালাতে চায়, আসলে যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন ক'রে

রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না—পুরুষের জন্যেই তো যতো রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হ'য়েছে নেহাৎ দায়ে প'ড়ে।"

মক্ষি ব'ল্‌লে, "তবে এ মোহ ভাঙ্‌তে চান কেন?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "স্বাধীনতা চাই ব'লে দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেই জন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁয়ায় তাকে এতোটুকু আড়াল ক'রে দেখ্‌তে পার্‌বো না—আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেই জন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্ব্বোধ ক'রে তোলার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করিনে।"

আমার মনে ছিলো যে-লোক ঘুমোতে ঘুমোতে চ'ল্‌চে তাকে হঠাৎ চম্‌কিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দ্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন ব'ল্‌লুম্ তার ভঙ্গীটা তার সুরটা বড়ো সাহসিক—জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ—কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষেরা ভালোবাসে ধোঁয়াকে, আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্তুকে—সেই জন্যেই পুরুষ পূজো ক'রতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হ'য়ে উঠ্‌তে চ'লেচে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিলো কিন্তু এই সব মাষ্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মতো মানুষ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হ'লো তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চ'ল্‌লো, সংসারে প্রবেশ ক'র্‌লে সেখানে ইস্কুল এসে ঢুক্‌লো। উচিত, ম'র্‌বার সময়ে ইস্কুলমাষ্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্ত্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা ক'রে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন তুর্ব্বৃত্ত আমিও কেমন থম্‌কে গেলুম্। আর আমাদের মক্ষি,—তার মুখ দেখেই মনে হ'লো সে এক মুহূর্ত্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হ'য়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে গেলো—তার হঠাৎ যেন মনে প'ড়ে গেলো পৃথিবীতে উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েণ্টস্‌ম্যানের মতো পথের ধারে ব'সে থাকে, তারা ভাবনার গাড়িকে খামকা এক লাইন থেকে আর এক লাইনে চালান ক'রে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সঙ্কুচিত হ'য়ে ফিরে যাবার চেষ্টা ক'র্‌ছিলেন—"মাপ ক'র্‌বেন আমি"—কথাটা শেষ ক'র্‌তে না ক'রতেই মক্ষি তাঁর পায়ের কাছে নত হ'য়ে প্রণাম ক'রলে,

আর ব'ল্‌লে, "মাষ্টারমশায়, যাবেন না, আপনি বস্থন।"—সে যেন ডুবো-জলে প'ড়ে গেছে, মাষ্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিম্বা আমি হয়তো ভুল বুঝ্‌চি। এর ভিতরে হয়তো একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষি হয়তো আমাকে আড়ম্বর ক'রে জানাতে চায় যে তুমি ভাব্‌চো, তুমি আমাকে অভিভূত ক'রে দিয়েচো! কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি! তাই করো না। মাষ্টারমশায়দের তো শ্রদ্ধা ক'র্‌তেই হবে। আমি তো মাষ্টারমশায় নই—আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাইনে। আমি তো ব'লেইচি ফাঁকিতে আমার পেট ভ'র্‌বে না;—আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুল্‌লেন। আমার ইচ্ছে ছিলো তাঁকে এক-টানা ব'কে যেতে দেবো, কোনো জবাব ক'র্‌বো না। বুড়োমানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো—তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্চে—বেচারারা জান্‌তে পারে না তাদের রসনা যেখানে চ'ল্‌চে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চ'ল্‌চে। প্রথমে খানিকটা চুপ ক'রে ছিলুম্‌—কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য্য আছে এ বদ্‌নাম তার পরম শক্রুরাও দিতে পার্‌বে না। চন্দ্রনাথ-বাবু যখন ব'ল্‌লেন, "দেখুন, আমরা কোনো দিনই চাষ করিনি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাবো এমন আশা যদি করি তবে—"

আমি থাক্‌তে পার্‌লুম্‌ না—আমি ব'ল্‌লুম্‌,—আমরা তো ফসল চাইনে। আমরা বলি, "মা ফলেষু কদাচন।"

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন—ব'ল্‌লেন, "তবে আপনারা কি চান।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "কাঁটাগাছ—যার আবাদে কোনো খরচ নেই।"

মাষ্টারমশায় ব'ল্‌লেন, "কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।"

অমি ব'ল্‌লুম্‌, "ওটা হ'লো ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা তো খড়ি-হাতে বোর্ডে বচন লিখ্‌চিনে। আমাদের বুক জ্ব'ল্‌চে এখন সেইটে বড়ো কথা—এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেবো—তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধ্‌বে তখন না হয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি? ম'র্‌বার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হ'বার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছট্‌ফট্‌ করাটাই শোভা পায়।"

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে ব'ল্‌লেন, "ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে চান করুন কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিম্বা কৃতিত্ব মনে ক'রে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েচে তারা ছট্‌ফট্‌ করেনি তারা কাজ ক'রেচে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেচে তারাই আচম্‌কা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে ত'রে যাবে।"

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যেই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্চি এমন সময় নিখিল এলো। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষির

দিকে চেয়ে ব'ল্‌লেন, "আমি এখন যাই, মা, আমার কাজ আছে।"

তিনি চ'লে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে ব'ল্‌লুম্‌, "মক্ষিরাণীকে এই বইটার কথা ব'ল্‌ছিলুম্‌।"

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয় আর এই ইস্কুলমাষ্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠক্‌তে দিলেই তবে ও ভালো ক'রে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম প'ড়ে দেখে চুপ্‌ ক'রে রইলো। আমি ব'ল্‌লুম্‌, "মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান্‌ কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট ক'রে তুলেচে, এই সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে ক'রে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট ক'রে তোল্‌বার কাজে লেগেচে; তাই আমি ব'ল্‌ছিলুম্‌, এ বইটা প'ড়ে দেখা ভালো।"

নিখিল ব'ল্‌লে, "আমি প'ড়েচি।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "তোমার কি বোধ হয়?"

নিখিল ব'ল্‌লে, "এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাব্‌তে চায় তাদের পক্ষে ভালো—যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "তার অর্থটা কি?"

নিখিল ব'ল্‌লে, "দেখো, আজকের দিনের সমাজে যে লোক

এমন কথা বলে যে, নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই, সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে একথা সাজে—আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এসব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।”

আমি ব'ল্লুম্, “প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাস্‌পোষ্ট্ যার আলোতে আমরা এসব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপ্‌ড়ে ফেলেই দিব্য দৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।”

নিখিল ব'ল্লে, “প্রবৃত্তিকে আমি তখনি সত্য ব'লে মনে মানি, যখন তার সঙ্গে-সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিষ গুঁজে দেখ্‌তে গেলে চোখ্‌কেই নষ্ট করি, দেখ্‌তেও পাইনে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিষ দেখ্‌তে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখ্‌তে পায় না।”

আমি ব'ল্লুম্, “দেখো নিখিল, ধর্ম্মনীতির সোনাবাঁধানো চষ্‌মার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি,—এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপ্‌সা দেখো, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে ক'র্‌তে পারো না।”

নিখিল ব'ল্লে, “জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলিনে।”

তবে?

মিথ্যা তর্ক ক'রে কি হবে? এসব কথা নিয়ে নিষ্ফল ব'ক্‌তে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিলো মক্ষি আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এপর্য্যন্ত একটি কথা না ব'লে চুপ্ ক'রে ব'সে ছিলো। আজ হয়তো আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি। তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে—ইস্কুলমাষ্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্চে।

কি জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হ'য়েছে কিনা। কিন্তু বেশ ক'রে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড় ব'লে মন নিশ্চিন্ত আছে, সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে ব'ল্‌লুম্, "তোমার সঙ্গে কথা হ'লো ভালই হ'লো। আমি আর একটু হ'লেই এ বইটা মক্ষিরাণীকে প'ড়্‌তে দিচ্ছিলুম্।"

নিখিল ব'ল্‌লে, "তাতে ক্ষতি কি? ও বই যখন আমি প'ড়েচি তখন বিমলই বা প'ড়্‌বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌বার আছে। আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিষকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই ক'র্‌চে —এম্‌নিভাবে আলোচনা চ'ল্‌চে যেন মানুষ পদার্থটা কেবল-মাত্র দেহতত্ত্ব, কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব—কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব-তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্চে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলোনা। তোমরা আমাকে বলো,

আমি ইস্কুল মাষ্টারের ছাত্র—আমি নই. সে তোমরা—মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাষ্টারের কাছ থেকে চিন্‌তে চাও—তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।”

আমি ব’ল্‌লুম্, “নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হ’য়ে আছো কেন?”

সে ব’ল্‌লে, “আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি তোমরা মানুষকে ছোটো ক’র্‌চো, অপমান ক’র্‌চো।”

কোথায় দেখ্‌চো?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মার্‌তে চাও!

এ কী তোমার পাগ্‌লামির কথা!

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ব’ল্‌লে, “দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু ম’র্‌বে না, এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হ’য়েছি—জেনে শুনে, বুঝে সুঝে।”

এই কথা ব’লেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চ’লে গেলো। আমি অবাক্ হ’য়ে তার এই কাণ্ড দেখ্‌চি এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দু’টো তিনটে বই মেঝের উপর প’ড়্‌লো, আর মক্ষিরাণী দ্রুত পদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চ’লে গেলো।

অদ্ভুত মানুষ, ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেচে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেচে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড়

ধ'রে বিদায় ক'রে দেয় না কেন? আমি জানি ও অপেক্ষা ক'রে আছে, বিমল কি করে। বিমল যদি ওকে বলে, তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলেনি, তবেই ও মাথা হেঁট ক'রে মৃদুস্বরে ব'ল্‌বে, তাহ'লে দেখ্‌চি ভুল হ'য়ে গেছে। ভুলকে ভুল ব'লে মান্‌লেই সব চেয়ে বড়ো ভুল করা হয়, একথা বোঝ্‌বার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কতো কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হ'লো নিখিল। ওরকম পুরুষ মানুষ আর দ্বিতীয় দেখিনি—ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা তো দূরের কথা।

তার পরে মক্ষি—বেশ বোধ হ'চ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেচে হঠাৎ আজ সেটা বুঝ্‌তে পেরেচে। এখন ওকে জেনে-শুনে হয় ফির্‌তে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে একবার পিছ'বে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতোই ছুটোছুটি করে আগুন ততোই বেশি ক'রে জ্ব'লে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি ক'রে বেড়ে উঠ্‌বে। আরো তো এমন দেখেছি। সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিলো। আর আমাদের হষ্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিলো সে আমার উপরে রাগ ক'র্‌লে; এক-একদিন মনে হ'তো সে আমাকে রেগে যেন ছিড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার

বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার ক'রে যাও যাও ব'লে আমাকে ঘর থেকে জোর ক'রে তাড়িয়ে দিলে—তারপরে যেম্‌নি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অম্‌নি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মেঝেতে মাথা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌লো। ওদের আমি খুব জানি—রাগ বলো, ভয় বলো, লজ্জা বলো ঘৃণা বলো এ সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তু'লে পু'ড়ে ছাই হ'য়ে যায়। যে জিনিষ এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হ'চ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হ'য়ে প'ড়ে প্রণাম করে—আমরা যেমন ক'রে আপিস করি—কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু ব'লবো না—এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে প'ড়্‌তে দেবো। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পারুক্ যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব ব'লে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হ'চ্ছে মডারন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডারন্ নয়। "মডারন্" এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তাহ'লেই ও জোর পাবে—কেননা ওদের তীর্থ চাই. গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই—শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক্, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্য্যন্ত দেখা যাক্। একথা জাঁক ক'রে ব'ল্‌তে পারবোনা আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে ব'সে মাঝে মাঝে কেবল

হাততালি দিচ্চি। বুকের ভিতরে টান প'ড়্চে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠ্চে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতোটুকু ছোঁওয়া, এতোটুকু চাওয়া, এতো-টুকু কথা অন্ধকার ভর্ত্তি ক'রে কেবলি ঘুরে' ঘুরে' বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিল্‌মিল্ ক'র্‌তে থাকে,—মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইচে।

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-ষ্ট্যাণ্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষির ছবি ছিলো। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়ে-ছিলুম্। কাল মক্ষিকে সেই ফাঁক্‌টা দেখিয়ে ব'ল্‌লুম্, "কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি ক'রে নেওয়াই উচিত। কি বলেন ?"

মক্ষি একটু হাস্‌লে, ব'ল্‌লে, "ও ছবিটি তো তেমন ভালো ছিলো না।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "কি করা যাবে ? ছবি তো কোনো মতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌বো।"

মক্ষি একখানা বই খুলে তার পাতা ওল্‌টাতে লাগ্‌লো। আমি ব'ল্‌লুম, "আপনি যদি রাগ করেন, আমি ওর ফাঁক্‌টা কোনো রকম ক'রে ভরিয়ে দেবো।"

আজ ফাঁক্‌টা ভরিয়েচি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের —তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেই রকম ছিলো।

তখন ইহকাল পরকালের অনেক জিনিষ বিশ্বাস ক'র্‌তুম্‌। বিশ্বাসে ঠকায় বটে কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই, ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইলো—আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবিনি। এখন প্রায় মাঝে-মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখ্‌বার চেষ্টা করি। বড়ো গম্ভীর—সব জিনিষকে বড়ো বেশি গুরুতর ক'রে দেখা আমার অভ্যাস।

আর কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই ক'রেই তো চ'ল্‌চে। সমস্ত জগতে আজ যতো দুঃখ ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে আছে, তাকে তো আমরা মনে-মনে ছায়ার মতো মায়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্চি খাচ্চি—তাকে যদি এক মুহূর্ত্ত সত্য ব'লে ধ'রে রেখে দেখ্‌তে পার্‌তুম্‌ তাহ'লে কি মুখে অন্ন রুচ্‌তো, না, চোখে ঘুম থাক্‌তো?

কেবল নিজেকেই সেই সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখ্‌তে পারিনে। মনে করি কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে অনন্তকালের বোঝা হ'য়ে হ'য়ে জ'মে উঠেছে। তাই এতো গম্ভীর—তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়!

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ্‌না। সেখানে যুগযুগান্তের

মহামেলায় লক্ষ-কোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী! কাকে বলো তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তু'লে দিনরাত্রি সাম্‌লে বেড়াচ্চো—জানো, বাইরে থেকে একটা পিন্ ফুট্‌লেই এক মুহূর্ত্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপ্‌সে যাবে!

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি ব'ল্‌তে চায়, না, আমি আমিই—তখনই আমি ব'ল্‌বো, সে কেমন ক'রে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি, ওটা কি একটা সত্য? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পু'রে ফেলে কি তালা বন্ধ ক'রে রাখা যায়?

স্ত্রী! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা-কিছু মধুর, যা-কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ ক'রেচি, একদিনো ওকে ধূলোর উপর নামাইনি—ঐ নামে কতো পূজার ধূপ, কতো সাহানার বাঁশি, কতো বসন্তের বকুল, কতো শরতের শেফালি! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মতো আজ হঠাৎ নর্দ্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তাহ'লে সেই সঙ্গে আমার—

ঐ দেখো, আবার গাম্ভীর্য্য! কাকে ব'ল্‌চো নর্দ্দমা, কাকে ব'ল্‌চো ঘোলা জল? ওসব হ'লো রাগের কথা। তুমি রাগ ক'র্‌বে ব'লেই জগতে এক জিনিষ আর হ'বে না। বিমল যদি তোমার না হয় তো সে তোমার নয়ই, যতোই চাপাচাপি রাগারাগি ক'র্‌বে ততোই ঐ কথাটাই আরো বড়ো ক'রে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে—তা যাক। তাতে বিশ্ব

দেউলে হবে না, এমন কি, তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়ো—সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে —এই জন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদ্‌তোও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে—সে সব কথা সমাজ ভাবুক্‌গে, যা ক'র্‌তে হয় করুক্‌। আমি কাঁদ্‌চি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তাহ'লে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্‌, আমি বিদায় হ'লুম্‌।

দুঃখ তো আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড়ো মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে-করে পারি বাঁচাবোই। কাপুরুষের মতো একথা মনে ক'র্‌তে পার্‌বো না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেলো। আমার জীবনের মূল্য আছে—সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখ্‌বার জন্যে আসিনি। আমার যা বড়ো ব্যবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য ক'রে ভাব্‌বার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেম্‌নি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখ্‌তে হবে। এতোদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামী আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়ে ছিলুম্‌। আমার সেই মানসী মূর্ত্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিলো তা নয়, কিন্তু তবু আমি তাকে পূজা ক'রে এসেচি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটিই আমার মহদ্দোষ। আমি লোভী—আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ ক'র্‌তে চেয়েছিলুম্—বাইরের বিমল তার উপলক্ষ্য হ'য়ে প'ড়েছিলো। বিমল যা সে তাই—তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হ'তেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্ম্মা আমারই ফর্‌মাস খাট্‌চেন না কি?

তাহ'লে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার ক'রে দেখে নিতে হবে। মায়ার রঙে যে সব চিত্র বিচিত্র ক'রেচি, সে আজ খুব শক্ত ক'রে মুছে ফেল্‌বো। এতোদিন অনেক জিনিষ আমি দেখেও দেখিনি। আজ একথা স্পষ্ট বুঝেছি বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিল্‌তে পারে সে হ'চ্চে সন্দীপ। এই-টুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় ক'র্‌বার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতোদিন সে আকর্ষণ ক'রে এসেচে, কিন্তু খুব কম ক'রেও যদি বলি তবু একথা আজ নিজের কাছে ব'ল্‌তে হবে যে, মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ম্বর-সভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার ক'র্‌লেন যিনি মালা দিলেন—আমার নয়। আজ আমার একথা অহঙ্কার ক'রে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য ক'রে না জানি, ও না স্বীকার

করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানব-জন্মের চরম অপমান ব'লেই মেনে নিতে হয়, তাহ'লে আমি আবর্জ্জনার মত সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে প'ড়বো, আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক্। চেনা-শোনা হ'লো—বাহিরকেও বুঝ্‌লুম্ অন্তরকেও বুঝ্‌লুম্। সমস্ত লাভ লোক্‌সান মিটিয়ে যা বাকি রইলো, তাই আমি। সে তো পঙ্গু-আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়; সে অন্তঃপুরের রোগীর পথ্যে মানুষ-করা রোগা-আমি নয়, সে বিধাতার শক্তহাতের-তৈরি-আমি। যা তার হবার তা হ'য়ে গেছে, আর তার কিছুতেই মার নেই।

এইমাত্র মাষ্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে ব'ল্‌লেন, "নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হ'য়ে গেছে।"

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না প'ড়্‌লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কথাবার্ত্তাও চলে,—কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা-রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কি কথা ব'ল্‌বো? আমার সমস্ত দেহ মন লজ্জিত হ'য়ে ওঠে।

আমি মাষ্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "আপনি এখনো ঘুমোন্‌নি কেন?"

তিনি একটু হেসে ব'ল্‌লেন, "আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাক্‌বার বয়স।"

এই পর্য্যন্ত লেখা হ'য়ে শুতে যাবো-যাবো ক'র্‌চি এমন সময়ে আমার জানালার সাম্‌নের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হ'য়ে গেলো—আর তারি মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠ্‌লো। আমার মনে হ'লো আমাকে সে ব'ল্‌লে, কতো সম্বন্ধ ভাঙ্‌চে গড়্‌চে স্বপনের মতো—কিন্তু আমি ঠিক্ আছি;—আমি বাসরঘরের চির-প্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত বুক ভ'রে উঠে মনে হ'লো—এই বিশ্ববস্তুর পর্দ্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হ'য়ে ব'সে আছে। কতো জন্মে কতো আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখ্‌লুম্—কতো ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধূলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি, "আয়নাটা আমারই ক'রে নিই, বাক্সর ভিতর ভ'রে রাখি, তখনই ছবি স'রে যায়। থাক্ না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট্ রইলো, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছো প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে রাখ্‌চে।

একটা সয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌চে এসব তোমার ছেলেভোলানো কথা। তা হোক্ না, ছেলেকে তো ভোলাতেই হবে—লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর

ছেলে—কতো ছেলের কতো কান্না! এতো ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবেনা—সে সত্য, সে সত্য—এই জন্যে বারে বারে তাকে দেখ্‌লুম্, বারে বারে তাকে দেখ্‌বো—ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেলো। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখ্‌বো। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস কোরো না—যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন প'ড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলোচুলের গন্ধ ভ'রে আছে, এবার যদি তা'র ঠিকানা ভুল ক'রে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোম্‌টা-খোলা তারা আমাকে ব'ল্‌চে, না, না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাক্‌বার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে,—সে বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর পরে আর সবই ভুল্‌বো, সব ভুল, সব কান্না—কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে—কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হ'য়ে যাচ্চে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে ব'লে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে

ঢু'ক্‌লেন। তখন আমাদের পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দু'টো বাজ্‌লো।

ঠাকুরপো, তুমি ক'র্‌চো কি? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও—তুমি নিজেকে এমন ক'রে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হ'য়ে গেছে সে আমি চোখে দেখ্‌তে পারিনে!

এই ব'ল্‌তে, ব'ল্‌তে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো।

আমি একটি কথাও না ব'লে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে শুতে গেলুম্‌।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করিনি, ভয় করিনি; আমি জান্‌তুম্ দেশের কাছে আত্মসমর্পণ ক'র্‌চি। পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণে কি প্রচণ্ড উল্লাস! নিজের সর্ব্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার ক'রে-ছিলুম্।

জানিনে. হয়তো এমনি ক'রেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেতো। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাক্‌তে পার্‌লেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তুল্‌লেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হ'য়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, তাঁর চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হ'য়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা ব'ল্‌বো, এই দুর্দ্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়-মূর্ত্তি দিনরাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হ'তে লাগ্‌লো বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছার্‌খার ক'রে দেওয়া! তাতে কতো লজ্জা, কতো ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে!

আর কৌতূহলের অন্ত নেই,—যে মানুষকে ভালো ক'রে জানিনে, যে মানুষকে নিশ্চয় ক'রে পাবো না, যে মানুষের

ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় জ্বল্‌চে, তার ক্ষুব্ধ কমনার রহস্য—সে কি প্রচণ্ড, কি বিপুল! এ তো কখনো কল্পনাও ক'র্‌তে পারিনি। যে সমুদ্র বহুদূরে ছিলো, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেচি মাত্র—এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি, জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে প'ড়্‌লো!

আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছিলুম্, কিন্তু সে ভক্তি গেলো ভেসে—তাঁকে শ্রদ্ধাও করিনে, এমন কি, তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট ক'রেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক্ ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পেরেচি যে সন্দীপের মধ্যে যে জিনিষটাকে পৌরুষ ব'লে ভ্রম হয়, সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজ্‌তে লাগ্‌লো। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা ক'র্‌তে চাই এবং এই বীণাটাকে,—কিন্তু বীণা তো বাজ্‌লো। আর সেই সুরে যখন আমার দিনরাত্রি ভ'রে উঠ্‌লো তখন আমার আর দয়ামায়া রইলো না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা কিছু আছে সব মজিয়ে দাও এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন, আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে ব'লতে লাগলো।

এ কথা আর বুঝ্‌তে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা—কি ব'ল্‌বো! যার জন্যে মনে হয় আমার ম'রে যাওয়াই ভালো।

মাষ্টারমশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্ত্তেই বড়ো ক'রে দেখ্‌তে পাই—বরাবর যেটাকে সীমা ব'লে মনে ক'রে এসেচি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু কি হবে! আমি অমন ক'রে দেখ্‌তেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েচে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক্ এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য ক'রে ক'র্‌তে পারিনে। সংসারের দুঃখ ঘটুক্, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে-পলে কালো হ'য়ে মরুক্, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিঁকে থাক্ এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পার্‌ছিনে। আমার ননদ মুন্নুর স্বামী যখন মদ খেয়ে মুন্নুকে মার্‌তো, তারপরে মেরে অনুতাপে হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তো, শপথ ক'রে ব'ল্‌তো আর কখনো মদ ছোঁবোনা, আবার তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মদ নিয়ে ব'স্‌তো—দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্ব'ল্‌তো। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে ভয়ানক—এ মদ কিনে আন্‌তে হয় না, গ্লাসে ঢাল্‌তে হয় না—রক্তের ভিতর থেকে আপ্‌না-আপ্‌নি তৈরি হ'য়ে উঠ্‌বে। কি করি! এম্‌নি ক'রেই কি জীবন কাট্‌বে?

এক একবার চম্‌কে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন—এক সময়ে হঠাৎ দেখ্‌তে পাবো এ-আমি সত্য নয়। এযে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই—এযে মায়া যাদুকরের মতো কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রঙীন ক'রে তুলেচে। এযে কি হ'লো, কেমন ক'রে হ'লো কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে।

একদিন আমার মেজ জা এসে হেসে ব'ল্‌লেন, "আমাদের ছোটো রাণীর গুণ আছে! অতিথিকে এতো যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল ন'ড়্‌তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিলো কিন্তু অতিথির এতো বেশি আদর ছিলো না—তখন একটা দস্তুর ছিলো স্বামীদেরও যত্ন ক'র্‌তে হ'তো। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে ব'লেই ফাঁকিতে প'ড়ে গেছে। ওর উচিত ছিলো অতিথি হ'য়ে এ বাড়িতে আসা, তাহ'লে কিছুকাল টিঁক্‌তে পার্‌তো—এখন বড়ো সন্দেহ। ছোটো রাক্কুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখ্‌তেও নেই ওর মুখের ছিরি কি রকম হ'য়ে গেছে!

এ সব কথা একদিন আমার মনে লাগ্‌তোই না; তখন ভাব্‌তুম্‌ আমি যে ব্রত নিয়েছি এরা তার মানেই বুঝ্‌তে পারে না। তখন আমার চারিদিকে একটা ভাবের আব্রু ছিলো—তখন ভেবেছিলুম্‌ আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্চি আমার লজ্জা সরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে। এখনকার

আলোচনা, মডারন্ কালের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ, এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে-ভিতরে ইংরিজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি—সেই সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চ'ল্‌চে যেটা হ'চ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতোদিন পাইনি—আমার মনে হ'তে লাগ্‌লো, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু আজ আর কোনো আড়াল রইলো না—কেন যে সন্দীপবাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন ক'রে কাটাচ্চেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ আলোচনা ক'র্‌চি, আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।

তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজো জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ ক'রে ব'ল্‌লুম্, "না, আমি আর বাইরের ঘরে যাবো না—ম'রে গেলেও না।"

দু'দিন বাইরে গেলুম্ না। সেই দু'দিন প্রথম পরিষ্কার ক'রে বুঝলুম্ কতো দূরে গিয়ে পৌঁচেছি। মনে হ'লো যেন একেবারে জীবনের স্বাদ চ'লে গেছে। যেন সমস্তই ছুঁড়ে ছুঁড়ে, ঠেলে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে ক'রে। মনে হ'লো কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আছে—যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে র'য়েছে।

খুব বেশি ক'রে কাজ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম্। আমার

শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিলো—তবু নিজে দাঁড়িয়ে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করালুম্। আলমারীর ভিতর জিনিষ-পত্র এক ভাবে সাজানো ছিলো, সে সমস্ত বের ক'রে, ঝেড়ে ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্য রকম ক'রে সাজালুম্। সেদিন নাইতে আমার বেলা দু'টো হ'য়ে গেলো। সেদিন বিকালে চুল বাঁধা হ'লো না, কোনোমতে এলোচুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরটা গোছাবার কাজে লোক-জনকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলা গেলো। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে চুরি অনেক হ'য়ে গেছে—তা নিয়ে কাউকে ব'ক্‌তে সাহস হ'লো না, পাছে একথা কেউ মনে-মনেও জবাব ক'রে, এতোদিন তোমার চোখ দু'টো ছিলো কোথা ?

সেদিন ভূতে পাওয়ার মতো এই রকম গোলমাল ক'রে কাট্‌লো। তারপরদিনে বই পড়্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লুম্। কি প'ড়্‌লুম্ কিছুই মনে নেই কিন্তু এক-একবার দেখি ভুলে অন্যমনস্ক হ'য়ে বই-হাতে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার রাস্তার জান্‌লার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হ'লো আমার জীবন-সমুদ্রের ওপারে চ'লে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া বইবে না। চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি। নিজেকে মনে হ'লো আমি যেন পশু দিনকার আমির ভূতের মতো—সেই সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখ্‌তে পেলুম্, সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ

হাতে ক'রে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম্ তাঁর মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক-একবার মনে হ'তে লাগ্‌লো যেন উঠোনটার উপর, বারান্দার রেলিং-গুলোর উপর রেগে-রেগে উঠ্‌চেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—যদি পার্‌তেন তো খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানার দিকে যাবো মনে ক'র্‌চি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজো জা দাঁড়িয়ে! "ওলো, অবাক্ ক'র্‌লি যে!"—এই কথা ব'লেই তিনি চ'লে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হ'লো না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে ব'ল্‌লে, "ছোটো-রাণীমা ভাঁড়ার দেবার বেলা হ'লো।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "হরিমতিকে বের ক'রে নিতে বল্।"—এই ব'লে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জান্‌লার কাছে ব'সে বিলিতি শেলাইয়ের কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌লুম্। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে ব'ল্‌লে, সন্দীপ বাবু দিলেন।—সাহসের আর অন্ত নেই;—বেহারাটা কি মনে ক'র্‌লে? বুকের মধ্যে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো চিঠি খুলে দেখি তাতে কোনো সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে,—"বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ"

রইলো আমার শেলাই প'ড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক ক'রে নিলুম্। সাড়িটা যেমন ছিলো তাই রইলো, জ্যাকেট্ একটা বদল ক'র্‌লুম্।

আমি জানি তাঁর চোখে এই জ্যাকেট্‌টির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে-বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় ব'সে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মমতো সুপুরি কাট্‌চেন। আজ আমি কিছুই সঙ্কোচ ক'র্‌লুম্ না। মেজো জা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"বলি চ'লেচো কোথায় ?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "বৈঠকখানা ঘরে।"

"এতো সকালে ? গোষ্ঠলীলা বুঝি ?"

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চ'লে গেলুম্। মেজো জা গান ধ'র্‌লেন—

"রাই আমার চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে !
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই !"

বিমলার আত্মকথা

বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ ক'রে ব্রিটিশ একাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখ্‌চেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ ব'লেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে ব'ল্‌লেন যে, আর্টিষ্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাক্‌তে যোগ্য লোকের অভাব হ'বে না।

এমন ক'রে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু ব'দ্‌লে এসেচে— সন্দীপের অহঙ্কারে তিনি ঘা দিতে পার্‌লে ছাড়েন না।

সন্দীপ ব'ল্‌লেন, "তুমি কি ভাবো, আর্টিষ্টদের আর গুরু-করণ দরকার নেই ?"

স্বামী ব'ল্‌লেন, "আর্ট সম্বন্ধে আর্টিষ্টদের কাছ থেকেই আমাদের মতো মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চ'ল্‌তে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।"

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ ক'রে খুব হাস্‌-লেন, ব'ল্‌লেন, "নিখিল, তুমি ভাবো দৈন্যটাই হ'চ্চে মূলধন, ওটাকে যতো খাটাবে ঐশ্বর্য্য ততোই বাড়্‌বে। আমি ব'ল্‌চি,

অহঙ্কার যার নেই, সে স্রোতের শ্যাওলা, চারি দিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।"

আমার মনের ভাব ছিলো অদ্ভুত রকম। একদিকে ইচ্ছেটা তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহঙ্কারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসঙ্কোচ অহঙ্কারটাই আমাকে টানে— সে যেন দামী হীরের ঝক্‌ঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার নেই; এমন কি, সূর্য্যের কাছেও সে হার মান্‌তে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুক্‌লুম্। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুন্‌তে পেলেন, কিন্তু যেন শোনেন নি এম্‌নি ভান ক'রে বইটা দেখ্‌তেই লাগ্‌লেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে ব'সেন। কেননা আর্টের ছুতো ক'রে সন্দীপ আমার সাম্‌নে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা ক'র্‌তে ভালোবাসেন আজো আমার তাতে লজ্জা বোধ ক'রার অভ্যাস ঘোচেনি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হ'তো যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

তাই একবার মুহূর্ত্তকালের জন্যে ভাব্‌ছিলুম্ ফিরে যাই,— এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মুখ তু'লে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন, "এই যে আপনি এসেচেন!"

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভৎর্সনা। আমার এমন দশা যে এই ভৎর্সনাকেও মেনে নিলুম্। আমার উপর সন্দীপের যে দাবী জন্মেচে তাতে

আমার দু'-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ! সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ ক'র্‌বার শক্তি কই।

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ্‌ ক'রে রইলুম্‌। যদিও আমি অন্যদিকে চেয়ে ছিলুম্‌ তবু বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম্‌ সন্দীপের দুই চক্ষের নালিশ আমার মুখের সাম্‌নে যেন ধন্না দিয়ে প'ড়েই ছিলো, সে আর ন'ড়্‌তে চাচ্ছিলো না। এ কি কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তু'ল্‌লে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে! বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এম্‌নি ক'রে লজ্জা অসহ্য হ'য়ে এলো তখন আমি ব'ল্‌লুম্‌, "আপনি কি দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?"

সন্দীপ ঈষৎ চ'ম্‌কে উঠে ব'ল্‌লেন, "কেন, দরকার কি থাক্‌তেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব-চেয়ে বড়ো তার এতোই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইরে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে, মক্ষিরাণী?"

আমার বুকের মধ্যে দুর্‌দুর্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আস্‌চে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হ'য়ে উঠ্‌লো। এই সর্ব্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সাম্‌লাবো কি ক'রে? আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ-থুব্‌ড়ে প'ড়্‌তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপ্‌ছিলো। আমি খুব শক্ত হ'য়ে

দাঁড়িয়ে তাঁকে ব'ল্‌লুম্‌, "সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কি কাজ আছে ব'লে আমাকে ডেকেচেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি।"

তিনি একটু হেসে ব'ল্‌লেন, "আমি তো সেই কথাই আপনাকে ব'ল্‌ছিলুম্‌। আমি যে পূজার জন্যেই এসেচি, তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই সে-কথা কি আপনাকে বলিনি? ভূগোলবিবরণ তো একটা সত্য বস্তু নয়—শুধু সেই ম্যাপ্‌টার কথা স্মরণ ক'রে কি কেউ জীবন দিতে পারে? যখন আপনাকে সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই তখনি তো বুঝ্‌তে পারি, দেশ কতো সুন্দর, কতো প্রিয়, প্রাণে তেজে কতো পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টীকা পরিয়ে দেবেন তবেই তো জান্‌বো আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েচি, তবেই তো সেই কথা স্মরণ ক'রে ল'ড়্‌তে ল'ড়্‌তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝ্‌বো সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল—কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন যে একখানি সাড়ি প'রে-ছিলেন, লাল মাটির মতো তার রং, আর তার চওড়া পাড় একটা রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই সাড়ির আঁচল,—সে কি আমি কোনো দিন ভুল্‌তে পার্‌বো! এই সব জিনিষই তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় ক'রে তোলে।"

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সন্দীপের দুই চোখ জ্ব'লে উঠ্‌লো। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌ না।

আমার সেই দিনের কথা মনে প'ড়্‌লো যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম্‌। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম্‌। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা চলে—তার অনেক কায়দা-কানুন আছে; কিন্তু আগুন যে আরেক জাতের, সে একনিমেষে চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর ক'রে তোলে। মনে হ'তে থাকে, যে-সত্য প্রতিদিনের শুক্‌নো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিলো, সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্ত্তি ধ'রে চারিদিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ ক'র্‌তে ছুটে চ'লেচে।

এর পরে আমার কিছু ব'ল্‌বার শক্তি ছিলো না। আমার ভয় হ'তে লাগ্‌লো এখনি সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধ'র্‌বেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপ্‌ছিলো আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে প'ড়্‌ছিলো।

সন্দীপ ব'লে উঠ্‌লেন, "আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড়ো ক'রে তুল্‌বেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ ক'র্‌তে পারি সে কি কেবল অন্দরের ঘোম্‌টামোড়া জিনিষ? আজ আর লজ্জা ক'র্‌বেন না, লোকের কানাঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।"

এম্‌নি ক'রে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন

আমার স্তব মিশিয়ে যায়—তখন সঙ্কোচের বাঁধন আর টেঁকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে। যতো দিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয়, আর বাস্তব অবাস্তবের বিচার চ'ল্‌ছিলো ততোদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। আজ সেই অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধ'রে উঠ্‌লো—সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ ক'র্‌লে। মনে হ'তে লাগ্‌লো আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায়রে! আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনি কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মতো বেরোয় না। আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠ্‌চে না কেন যা মন্ত্রের মতো এখনি সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত ক'রে [illegible]?

এমন সময়ে হাউ-মাউ ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমার ঘরে ক্ষেমাদাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, "আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চ'লে যাই, আমি সাতজন্মে এমন—হাউ হাউ! হাউ হাউ!"

কি? ব্যাপারটা কি?

মেজোরাণীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে প'ড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রেচে—তাকে যা মুখে আসে তাই ব'লে গাল দিয়েছে।

আমি যতো বলি, আচ্ছা সে আমি বিচার ক'র্‌বো—কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকাল বেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জ'মে উঠেছিলো তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠ্‌লো। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনি অন্তঃপুরে ছুট্‌তে হ'লো। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় ব'সে এক-মনে মাথা নীচু ক'রে সুপুরি কাট্‌চেন,—মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ গান ক'র্‌চেন, "রাই আমার চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে,"—ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হ'য়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি ব'ল্‌লুম্, "মেজোরাণী তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছি-মিছি গাল দেয় কেন?"

তিনি ভুরু তু'লে আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটাপেটা ক'রে দূর ক'রে দেবো। দেখ দেখি এই সক্কাল বেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি ক'রে দিলে। ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখ্‌চি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে একটু গল্প ক'র্‌চে—একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত—লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে ব'সেচে। তা ছোটোরাণী, এ সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন ক'রে পারি সব মিটিয়ে দিচ্চি।"

আশ্চর্য্য মানুষের মন! এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে! এই সকাল বেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ আলোচনা ক'র্‌তে

যাওয়া, আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এম্‌নি সৃষ্টিছাড়া ব'লে মনে হ'লো যে, আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চ'লে গেলুম্‌।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময় বুঝে মেজোরাণী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিয়েচেন। কিন্তু আমি এম্‌নি টল্‌মলে জায়গায় আছি যে এসব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারিনে। এই তো সেদিন নন্‌কু দারোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যে রকম উদ্ধত-ভাবে ঝগ্‌ড়া ক'রেছিলুম্‌ শেষ পর্য্যন্ত তা টি'ক্‌লো না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এলো। এর মধ্যে আবার মেজোরাণী এসে আমার স্বামীকে ব'ল্‌লেন, "ঠাকুরপো, আমারি অপরাধ। দেখ ভাই, আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর চাল-চলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না—সেইজন্যে ভালো মনে ক'রেই আমি দারোয়ানকে—তা এতে যে ছোটোরাণীর অপমান হবে একথা মনেও করিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম্‌ উল্টো! হায়রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!"

এমনি ক'রে দেশের দিক থেকে পূজার দিক থেকে যে কথাটাকে এতো উজ্জ্বল ক'রে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন ক'রে ঘুলিয়ে উঠ্‌তে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে জানলার কাছে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম্‌, চারদিকের সঙ্গে সুর

মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতোই সরল হ'তে পারে! ঐ যে মেজোরাণী নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় ব'সে সুপুরি কাট্‌চেন, ঐ সহজ আসনে ব'সে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হ'য়ে উঠ্‌লো! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্‌খানে? আমি কি ম'রে যাবো, সন্দীপ কি চ'লে যাবে, এ সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মতো সুস্থ হ'য়ে উঠে একেবারে ভু'লে যাবো—না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্ব্বনাশের তলায় তলিয়ে যাবো যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌লুম্‌ না—এমন ক'রে ছারখার ক'রে দিলুম্‌ কি ক'রে?

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বৌ হ'য়ে পা দিয়েছিলুম্‌, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক্‌ হ'য়ে আছে। এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আমার স্বামী কল্‌কাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্‌ এক দ্বীপের অনেক দামী এই পর-গাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই ক'টি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিলো সে যেন সৌন্দর্য্যের কোন্‌ পেয়ালা একেবারে উপুড় ক'রে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন ঐ ক'টি পাতার কোলে ফুল হ'য়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্চে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা দু'জনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানালার কাছে টাঙিয়ে রেখেচি। সেই একবার ফুল হ'য়েছিলো, আর হয়নি, আশা

আছে আবার আর একদিন ফুল ফুট্‌বে। আশ্চর্য্য এই যে, অভ্যাসমতো আজো এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্চি; আশ্চর্য্য এই যে, সেই নারকেল দড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট ক'রে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আল্‌গা হ'লো না—তার পাতাগুলি আজো সবুজ আছে।

আজ চার বছর হ'লো আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম্‌। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুল্‌তে পারিনে। আজ ছ'দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সাম্‌নে রেখে প্রণাম ক'রেচি। কতোদিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হ'য়ে গেছে।

একদিন তিনি ব'ল্‌লেন, "তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো ক'রে তু'লে পূজো করো, এতে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "কেন তোমার লজ্জা?"

স্বামী ব'ল্‌লেন, "শুধু লজ্জা নয় ঈর্ষ্যা।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "শোনো একবার কথা? তোমার আবার ঈর্ষ্যা কাকে?"

স্বামী ব'ল্‌লেন, "ঐ মিথ্যে আমিটাকে। এর থেকে বুঝ্‌তে পারি এই সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত ক'রে দেবে; আরেকটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গ'ড়ে তোমার মন ভোলাচ্চ।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "তোমার এই কথাগুলো শুন্‌লে আমার রাগ হয়।"

তিনি ব'ল্‌লেন, "রাগ আমার উপরে ক'রে কি হবে, তোমার অদৃষ্টের উপরে করো. তুমি তো আমাকে স্বয়ম্বর সভায় বেছে নাওনি, যেমনটি পেয়েচো তেমনটি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হ'য়েচে—কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পারো সংশোধন ক'রে নিচ্চো। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হ'য়েছিলেন ব'লেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হ'তে পারোনি ব'লেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্চো।"

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এতো রাগ ক'রেছিলুম্‌ যে আমার চোখ দিয়ে জল প'ড়েছিলো। তাই মনে ক'রে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুল্‌তে পারিনে।

ঐ যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানা ঘর ঝাড়পোঁচ ক'র্‌বার উপলক্ষ্যে সেই ফোটোষ্ট্যাণ্ডখানা তুলে এনেচি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি তো পূজো করিনে, তাকে প্রণাম করা চলে না—সে রইলো আমার হীরে মাণিক মুক্তোর মধ্যে ঢাকা। সে লুকোনো রইলো ব'লেই তার মধ্যে এতো পুলক! ঘরে সব দরজা বন্ধ ক'রে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উস্কে তুলে তার সাম্‌নে ঐ ছবিটা ধ'রে চুপ ক'রে চেয়ে ব'সে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি

এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই—আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে মাণিক মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ ক'রে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই হীরে মাণিক মুক্তো তোকে দিয়েছিলো কে? এর মধ্যে কতো দিনের কতো আদর জড়িয়ে আছে! তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে? মরণ হ'লে যে বাঁচি!

সন্দীপ একদিন আমাকে ব'লেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই. তার এক-মাত্র আছে সাম্‌নে। তিনি বারবার ব'লেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগ্‌বে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌বে, "আমরা চাই,"—সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো মন্দ, কোনো সম্ভব অসম্ভবের তর্ক বিতর্ক টিঁক্‌তে পার্‌বে না; তাদের কেবল এক কথা, "আমরা চাই!" আমি চাই, এই বাণীই হ'চ্চে সৃষ্টির মূল বাণী—সেই বাণীই কোনো শাস্ত্র বিচার না ক'রে আগুন হ'য়ে সূর্য্যে তারায় জ্বলে' উঠেচে। ভয়ঙ্কর তার প্রণয়ের পক্ষপাত—মানুষকে সে কামনা ক'রেচে ব'লেই যুগ যুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেচে। সৃজন প্রলয়ের সেই ভয়ঙ্করী "আমি চাই" বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্ত্তিমতী! সেই জন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চে পাছে সে তাদের কুম্‌ড়ো ক্ষেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে

দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চ'লে যায়। পুরুষ মনে ক'রে আছে এই বাঁধকে সে চিরকালের মতো পাকা ক'রে বেঁধে রেখেচে। জম্‌চে, জল জম্‌চে,—হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর, আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না, পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্ত্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙ্‌বে,—তখন এতোদিনের বোবা শক্তি "আমি চাই" "আমি চাই" ব'লে গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ছুট্‌বে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝ্‌তে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা—সে আমার মেজো জায়ের মূর্ত্তি ধ'রে বাইরে ব'সে ব'সে সুপুরি কাট্‌তে কাট্‌তে কটাক্ষপাত ক'র্‌চে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! "আমি চাই" এই কথাটাকেই নিঃসঙ্কোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে ব'ল্‌তে পারাই হ'চ্চে আপনার পূর্ণ প্রকাশ—না ব'ল্‌তে পারাই হ'চ্চে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি—আমার এই উদ্দীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ ক'রে অপমান করে এমন সাধ্য ওদের কী আছে!

এই ব'লে তখনি ইচ্ছে হ'লো, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই—ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি

—প্রলয় শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক্। হাত উঠেছিলো কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধ্‌লো, চোখে জল এলো—মেজের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম্। কি হবে, আমার কি হবে! আমার কপালে কি আছে!

সন্দীপের আত্মকথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন প'ড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই?

পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিষ নয়, সে নিশ্বাস ফেল্‌চে, তার সমস্ত নদী সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠ্‌চে,—সেই বাষ্পে সে ঘেরা, তার চতুর্দ্দিকে ধূলো উড়্‌চে, সেই ধূলোর ওড়্‌নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখ্‌বে, এই বাষ্প আর ধূলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখ্‌তে পাবে। সে কি এর দেশ মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলি আইডিয়ার নিশ্বাস উঠ্‌চে, এই জন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট; যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না,—মনে হয় সে যেন আলো-ছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হ'চ্চে যেন, সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁক্‌চি। কিন্তু আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত ক'র্‌চি আমি যে আগাগোড়া

কেবল তাহাই, তা তো নয়,—আমি যা ভালোবাসিনে, যা ইচ্ছে করিনে আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হ'য়ে গেছে—আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারিনি, হাতে যা পেয়েচি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হ'চ্চে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্ব্ব-সাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্ব্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ঙ্কর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হ'য়ে ওঠে। সে চারিদিকের প্রতি ন্যায় বিচার ক'রে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সকল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বলো, জাত বলো এ পর্য্যন্ত লক্ষপতি মহীপতি হ'য়ে উঠ্‌চে। ১-কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হ'য়ে উঠ্‌তে পারে—নইলে ১-এর সমতল লাইন একটানা হ'য়ে চ'ল্‌তো।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনি দগ্ধ না করে, তখনি ছাই হয়ে যায়। যখনি কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় ক'র্‌তে অক্ষম হয়, তখনি পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয়। যতোই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক্ আছে, তার ভিতর

থেকে একটা জিনিষ বেরিয়ে পড়ে সে নেহাৎ কাঁচা অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্ব্বেই তৈরি হ'য়ে গেছে।

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি ক'র্‌তে গিয়েছিলুম্। একটা ছাগল চ'রে বেড়াচ্ছিলো, আমি সবাইকে ব'ল্‌লুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আন্‌তে পারে? সকলেই যখন ইতস্তত ক'র্‌ছিলো আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম্। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলো। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্ব্বিকার মহাপুরুষ ব'লে আমার পায়ের ধূলো নিলে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখ্‌লে; কিন্তু যেখানে আমি, নিজের দোষে না ভাগ্যদোষে, দুর্ব্বল সকরুণ, যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাট্‌ছিলো সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই যে একটা অধ্যায় জ'মে উঠ্‌চে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা প'ড়েচে। ঢাকা প'ড়্‌তো না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাক্‌তো। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মৎলবে গ'ড়্‌চে কিন্তু সেই মৎলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকী পড়ে থাক্‌চে—সেইটের সঙ্গে আমার মৎলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না—এই জন্যে

তাকে চেপেচুপে ঢেকেঢুকে রাখ্‌তে চাই—নইলে সমস্তটাকে সে মাটি ক'রে দেয়।

প্রাণ জিনিষটা অস্পষ্ট, সে যে কতো বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক্‌ নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট ক'রে জান্‌তে চাই—সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর থেকে সুরু ক'রে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রক্‌ফেলার পর্য্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কিম্বা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখ্‌তে পেরেচে ব'লেই নিজেকে সফল ক'রে জেনেচে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো। সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না জানাটাই হ'চ্চে জানা। সে বলে, "তুমি যাকে ফল-পাওয়া বলো, সে হ'চ্চে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়ো।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "কথাটা নেহাৎ ঝাপ্‌সা হ'লো।"

নিখিল ব'ল্‌লে, "উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই ব'লে প্রাণটাকে কল ব'লে সোজা ক'রে জান্‌লেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেম্‌নি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম ক'রে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা ব'লবো না।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখ্‌চো? কোন্‌ নাকের ডগায়, কোন্‌ ভ্রূর মাঝ্‌খানে?"

সে ব'ল্‌লে, "আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জান্‌চে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চ'লে যাচ্চে।"

"তাহ'লে নিজের দেশ সম্বন্ধে কি ব'ল্‌বে?"

"ঐ একই কথা। যেখানে দেশ ব'লে, আমি আমাকেই লক্ষ্য ক'র্‌বো, সেখানে সে ফল পেতে পারে কিন্তু আত্মাকে হারায়—যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো ক'রে দেখে, সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে কিন্তু আপনাকে সে পায়।"

"ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখ্‌চো?"

"মানুষ এতো বড়ো যে, সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা ক'র্‌তে পারে তেম্‌নি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয় তো নেই—বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধ'রে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, সে কি ফলের সাধনা?"

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝ্‌তে পারিনে তা নয়। কিন্তু সেইটিই হ'লো আমার মুস্কিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম—সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে ম'র্‌তে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত ক'রার পথে চলা যে পাগ্‌লামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এই জন্যেই আমাদের দেশে আজকাল

অদ্ভুত ব্যাপার চ'ল্‌চে। ধর্ম্মের ধূয়ো দেশের ধূয়ো দু'টিকেই পুরো দমে এক সঙ্গে চালাচ্চি—ভগবদ্গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই—তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হ'তে পার্‌চে না, তাতে এক সঙ্গেই গ'ড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চ'ল্‌চে, এ আমরা বু'ঝ্‌চিনে। আমার জীবনের কাজ হ'চ্চে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো. আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বাহাল রাখ্‌বো—সানাই আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেচে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েছেন তাকে আমরা লজ্জা দেবো না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্ম্মল, যেমন নির্ম্মল ভুঁইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখ্‌তে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন ক'দিন ধ'রে মাথায় ঘুর্‌চে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেল্‌তে দিচ্চি? আমার জীবনটা তো ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে চ'ল্‌বে।

সেই কথাই তো ব'ল্‌ছিলুম্‌, যে-একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত ক'র্‌তে চাই, জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ে। এবার আমি যেন বেশী দূরে ছিট্‌কে প'ড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হ'য়ে উঠেচে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌চি ও আমাকে চায়—ওই তো আমার স্বকীয়া। গাছে ফল

বোঁটায় ঝুলে আছে—সেই বোঁটার দাবীকেই চিরকালের ব'লে মান্‌তে হবে না কি? ওর যতো রস, যতো মাধুর্য্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খ'সে প'ড়্‌বার জন্যেই—সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা,—সেই ওর ধর্ম্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আন্‌বো, ওকে ব্যর্থ হ'তে দেবো না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে প'ড়্‌চি, মনে হ'চ্চে আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হ'য়ে উঠ্‌বে। আমি পৃথিবীতে এসেচি কর্ত্তৃত্ব ক'র্‌তে—আমি লোককে চালনা ক'র্‌বো কথায় এবং কাজে,—সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া, আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানে না শুধু আমিই জানি, কাঁটায় তার পায়ে রক্ত প'ড়্‌বে, কাদায় তার গা ভ'রে যাবে, তাকে বিচার ক'র্‌তে দেবো না তাকে ছোটাবো।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হ'য়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়্‌চে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠ্‌লো, কিন্তু আমি ক'র্‌চি কি? দিনের পর দিন আমার কি নিয়ে কাট্‌চে? ওদিকে আমার এমন শুভদিন যে ব'য়ে গেলো!

আমার ধারণা ছিলো আমি ঝড়ের মতো ছুটে চ'ল্‌তে পারি—ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত ক'রে না। কিন্তু এবার যে আমি

ফুলের চারিদিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি ভ্রমরেরই মতো : ঝড়ের মতো নয়।

তাইতো বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রঙ তো পাকা হ'য়ে ধরে না, হঠাৎ দেখ্‌তে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোনো-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখ্‌তেন তাহ'লে নিশ্চয় দেখা যেতো আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাৎ নেই—এমন কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্ম-কাহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে প'ড়্‌ছিলুম্। তখন সবে বি, এ, পাশ ক'রেচি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে প'ড়্‌চে ব'ল্‌লেই হয়। তখন থেকেই পণ ক'রেছিলুম্ নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেবো না—জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব ক'রে তুল্‌বো। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন-কাহিনীটাকে কি দেখ্‌চি? কোথায় সেই ঠাস বুনোনি? এ যে জালের মতো—সূত্র বরাবর চ'ল্‌চে—কিন্তু সূত্র যতো-খানি, ফাঁক তার চেয়ে বেশী বই কম নয়। এই ফাঁকাটার সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেলো না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে জোরের সঙ্গেই চ'ল্‌ছিলুম্—আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগ্‌চে। "আমি চাই, হাতের কাছে এসেচে, ছিঁড়ে নেবো"—এ হ'লো খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা,—এই রাস্তায় যারা চ'ল্‌তে পারে

তারাই সিদ্ধিলাভ করে এই কথা আমি চিরদিন ব'লে আস্চি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ ক'র্তে দিলেন না, তিনি কোথা থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট ক'রে দেন।

দেখ্চি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছট্‌ফট্ ক'র্চে, তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কতো ভয়, কতো করুণা, জোর ক'রে বাঁধন ছিঁড়্‌তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত—ব্যাধ তো এই দেখে খুসী হয়। আমার খুসী আছে কিন্তু ব্যথাও আছে। সেই জন্যে কেবলি দেরি হ'য়ে যাচ্চে—তেমন জোরে ফাঁস ক'র্তে পার্চিনে।

আমি জানি দু'বার-তিনবারে এমন এক-একটা মুহূর্ত্ত এসেচে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধ'রে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আন্‌লে সে একটি কথা ব'ল্‌তে পার্‌তো না,—সেও বুঝ্‌তে পার্‌ছিলো এখনি একটা কি ঘ'ট্‌তে যাচ্চে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য একেবারে ব'দ্‌লে যাবে ;—সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে, তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি ; এই সময়টুকুর মধ্যে একটা কিছু স্থির হ'য়ে যাবে তারি জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিঃশ্বাস রোধ ক'রে যেন থ'ম্‌কে দাঁড়িয়ে ; কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত-গুলিকে ব'য়ে যেতে দিয়েচি—নিঃসঙ্কোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিত-প্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হ'য়ে উঠ্‌তে দিই নি। এর থেকে বুঝ্‌তে পার্‌চি এতোদিন যে সব বাধা আমার প্রকৃতির

মধ্যে লুকিয়ে ছিলো, তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েচে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক ব'লে শ্রদ্ধা করি সেও এম্‌নি ক'রেই ম'রেছিলো। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক ব'নে রেখেছিলো—অতো-বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিলো তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেলো। এই সঙ্কোচটুকু না থাক্‌লে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজো ক'র্‌তো। এই রকমেরই একটু সঙ্কোচ ছিলো ব'লেই যে-বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিলো, তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা ক'র্‌লে, আর ম'লো নিজে।

জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হ'য়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে তার পরে বড়োকে এক মুহূর্ত্তে কাৎ ক'রে দেয়। মানুষ আপনাকে যা ব'লে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এতো অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত—তাকে দেখে' যে এতো হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার ক'র্‌তে পারিনে যে, সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবিনি কিন্তু যতোই দিন যাচ্চে তার কাছে লজ্জা পাচ্চি কষ্টও বোধ হ'চ্চে। এক-একদিন আগেকার মতো তার সঙ্গে খুব ক'রে গল্প ক'র্‌তে, তর্ক ক'র্‌তে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়ে—এমন কি, যা কখনো করিনে তাও

করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান ক'রে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিষটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না—এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তার জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে চাই, কোনো মতে দেখাটা না হ'লেই বাঁচি। এই সব হ'চ্চে দুর্ব্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মান্‌বামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিষ হ'য়ে দাঁড়ায়—তখন তাকে যতোই অবিশ্বাস করিনা কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসঙ্কোচে জানাতে চাই, এ সব জিনিষকে বড়ো ক'রে বাস্তব ক'রে দেখ্‌তে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার ক'র্‌তে পার্‌চিনে এইবার আমাকে দুর্ব্বল ক'রেচে। আমার এই দুর্ব্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি—আমার অসঙ্কোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে। আবেশের ধোঁয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয়, কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ম্বরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে কিন্তু সেটা দেখে' ও চোখ বুজ্‌তে চায়।

কিন্তু ফের্‌বার পথ বন্ধ হ'য়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়্‌তে পার্‌বো এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখ্‌চিনে। তাই ব'লে নিজের পথটাও আমি ছাড়্‌তে পারবো না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ—এই অন্তঃ-

পুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়্তে পার্বো না, বিশেষত আজকের দিনে,—বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেবো। যে পশ্চিমের ঝড় আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোম্‌টা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোম্‌টা খুল্‌বে—সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাক্‌বে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুল্‌বে তরী, উড়্‌বে তাতে 'বন্দে-মাতরং-জয়পতাকা', চারিদিকে গর্জ্জন আর ফেনা—সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা! বিমলা সেখানে মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখ্‌বে যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খ'সে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠ্‌তে ওর এক মুহূর্ত্তের জন্যে বাধ্‌বে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমা-সুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেচি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতো তা হ'লে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেতুম্—সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দ্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক—বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা ক'র্‌বো। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টল্‌মল্ ক'র্‌চে—কচি ধানের আভা যেন কচিছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ীর বাগানের নীচে পর্য্যন্ত জল এসেচে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্য্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়েচে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারিনে? খালের জল ঝিল্‌-মিল্ ক'র্‌চে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্ ক'র্‌চে, ধানের ক্ষেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠ্‌চে—এই শরতের প্রভাত সঙ্গীতে আমিই কেবল বোবা। আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ, আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আট্‌কা প'ড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না। আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তি-হীন আপনাকে যখন দেখ্‌তে পাই তখন বুঝ্‌তে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পার্ব্বে কেন?

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেই জন্যে এই ন-বছরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নহে। আমি কেবল গ্রহণ ক'রতেই পারি কিন্তু নাড়া দিতে পারিনে।

আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো—বিমল এতোদিন যে কি দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিলো, তা আজকের ওকে দেখে বুঝ্‌তে পার্‌চি। দোষ দেবো কাকে?

হায় রে, ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আমার মন্দির যে শূন্য থাক্‌বার জন্যেই তৈরি—ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিলো সে মন্দিরের বাইরেই বসেছিলো, এতোকাল তা বুঝ্‌তে পারিনি। মনে ক'রেছিলুম্‌, অর্ঘ্য সে নিয়েছে বরও সে দিয়েচে—কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর!

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা-যৌবনে আমরা দু'জনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহর বিলে বোটে ক'রে বেড়াতে যেতুম্‌। কৃষ্ণা পঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যা বেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেক্‌তো তখন আমরা বাড়ী ফিরে আস্‌তুম্‌। আমি বিমলকে ব'ল্‌তুম্‌, "গানকে বারে বারে আপন ধূয়োয় ফিরে আস্‌তে হয়;—জীবনে মিলন-সঙ্গীতের ধূয়োই হ'চ্চে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে; এই ছল্‌ছল্‌-করা জলের উপরে যেখানে 'বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ', যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোম্‌টা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাত্‌চে, সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হ'য়েছিলো, দেয়ালের মধ্যে নয়,—তাই এখানে আমরা একবার ক'রে সেই আদি যুগের প্রথম মিলনের

ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে মিলন হ'চ্চে হরপার্ব্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস-সরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর তু'বছর কলিকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেচে —তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেচে। জীবনের সেই এক সপ্তক এম্‌নি ক'রে কাট্‌লো। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হ'য়েচে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেচে সে কথা আমি তো কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌চিনে। প্রথম তিন দিন তো কেটে গেলো—বিমলের মনে প'ড়েচে কি না জানিনে কিন্তু মনে করিয়ে দিলো না। সব একেবারে চুপ্‌ হ'য়ে গেলো, গান থেমে গেচে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে—কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়।

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগ্‌চে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী ক'রে রাখ্‌বো, এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হ'য়ে গেচে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার

বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেবো, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাবো না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে-রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারো কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও—দুঃখ বুকের মাণিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পারো!

আমার মনে হ'চ্চে যেন এইবার আমি একটা জিনিষ বুঝ্‌তে পারার কিনারায় এসেচি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসা-টাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এতদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে তুলেচি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আন্‌তে পার্‌চিনে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন ক'রে তুল্‌চি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা ক'র্‌বার দিন এসেচে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েচে; কিন্তু তার সাম্‌নে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হ'বে এমন পূজা আমরা মান্‌বো না। সাজে-সজ্জায়, লজ্জা-সরমে, গানে-গল্পে, হাসি-কান্নার যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি ক'রেচে তাকে ছিন্ন ক'র্‌তে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পঞ্চশরের

পূজার উপচার যোগাচ্চে জগতের আনন্দলীলাকে এমন ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'র্‌তে মানুষ পারে কি ক'রে? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েচে? আমি যে মদ এতোদিন পান ক'রেছিলুম্ তার রঙ এতো লাল নয়, কিন্তু তার নেশা তো এমনই তীব্র। এই নেশার ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্ গুন্ ক'রে ম'র্‌চি,—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! ব'ল্‌তে লজ্জা করে না? এতো বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হ'লো? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা ব'লে জেনেচি তাই ব'লে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হ'য়ে গেলো?

শোবার ঘরের শেল্‌ফ থেকে একটা বই আন্‌তে আজ সকালে গিয়েছিলুন্। কতোদিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকিনি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো! সেই আন্‌লাটিতে বিমলের কোঁচানো সাড়ি পাকানো র'য়েচে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌চে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের সিসি, সেই সঙ্গে সিঁদূরের কৌটোটিও! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট একজোড়া জরি-দেওয়া চটি জুতো,—একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো প'রতে চাইতো না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার

এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম্। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্য্যন্ত এই জুতো প'রে যেতে সে লজ্জায় ম'রে গিয়েছিলো। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় ক'রেচে কিন্তু এই চটি জোড়াটি সে আদর ক'রে রেখে দিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিলুম্, "যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে তুমি আমার পূজো করো—আমি তোমার পায়ের ধূলো নিবারণ ক'রে আজ আমার এই জাগ্রত দেবতার পূজো ক'র্‌তে এসেচি।" বিমল ব'ল্‌লে, "যাও তুমি অমন ক'রে বোলো না তাহ'লে কখ্‌খনো ও জুতো প'র্‌বো না।"—এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর—এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে – আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই সমস্ত অতি ছোটো ছোটো জিনিষের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে র'য়েছে তা আজ যেমন ক'রে অনুভব ক'র্‌লুম্ তেমন আর কোনোদিন করিনি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা প'ড়্‌লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা তো নয়, ঐ চটি জোড়াটা পর্য্যন্ত তাকে টেনে ধ'র্‌তে চায়। সেই জন্যেই তো লক্ষ্মী ত্যাগ ক'র্‌লেও তাঁর ছিন্ন পদ্মের পাপ্‌ড়িগুলোর চারিদিকে মন এমন ক'রে ঘু'রে ঘু'রে বেড়ায়।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ প'ড়্‌লো। দেখি আমার সেই ছবি তেম্‌নিই র'য়েচে, তার সাম্‌নে অনেক দিনের শুক্‌নো কালো ফুল প'ড়ে আছে। এমনতর পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই।

এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার ! এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক্, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্ত্তিতেই গ্রহণ ক'র্‌লুম্—কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মতো নির্ব্বিকার হ'তে পার্‌বো ?

এমন সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়্‌লো। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেল্‌ফের দিকে যেতে যেতে ব'ল্‌লুম্, "Amiel's Journal বইখানা নিতে এসেচি।" এই কৈফিয়ৎটুকু দেবার কি যে দর্‌কার ছিলো তা তো জানিনে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন কিছুর মধ্যে চোখ দিতে এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাক্‌বারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পার্‌লুম্ না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম্।

বাইরে আমার ঘরে ব'সে যখন বই পড়া অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হ'য়ে দাঁড়ালো—কিছু দেখ্‌তে বা শুন্‌তে, ব'ল্‌তে বা ক'র্‌তে লেশ-মাত্র আর প্রবৃত্তি রইলো না, যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে জমাট হ'য়ে, অচল হ'য়ে আমার বুকের উপর পাথরের ন্যায় চেপে ব'স্‌লো ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নার্‌কেল নিয়ে আমার সাম্‌নে রেখে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌লে।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "এ কি পঞ্চু ? এ কেন ?"

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাষ্টার মশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপরে সে গরীবের একশেষ—ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ ক'র্‌বার অধিকার আমার নেই। মনে ভাব্‌ছিলুম্‌ বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হ'য়ে বক্‌শিশের ছলে অন্ন সংগ্রহের এই পন্থা ক'রেচে।

পকেটের টাকার থলি থেকে তুটো টাকা বের ক'রে যখন ওকে দিতে যাচ্চি তখন ও জোড়-হাত ক'রে ব'ল্‌লে, "না হুজুর, নিতে পার্‌বো না।"

"সে কি পঞ্চু?"

"না, তবে খুলে বলি। বড়ো টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারী বাগান থেকে আমি নার্‌কেল চুরি ক'রে-ছিলুম্‌। কোন্‌ দিন ম'র্‌বো তাই শোধ ক'রে দিতে এসেচি।

Amiel's Journal প'ড়ে আজ আমার কোনো ফল হ'তো না—কিন্তু পঞ্চুর এই এক-কথায় আমার মন খোলসা হ'য়ে গেলো। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখতুঃখ ছাড়িয়ে ঐ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসি-কান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাষ্টার মশায়ের একজন ভক্ত। কেমন ক'রে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে ক'রে পান দোক্তা রঙীন সুতো ছোটো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিষ নিয়ে হাঁটু-

জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায়; সেখানে এই জিনিষগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফির্‌তে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাট্‌তে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ী এসে শাঁখা তৈরি ক'র্‌তে বসে—তাতে প্রায় রাত ত্বপুর হ'য়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম ক'রেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে ত্ব'বেলা ত্ব'মুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে ব'সেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হ'চ্চে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চারমাস তার একবেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে একে কিছু দান ক'র্‌তে চেয়েছিলুম্‌। মাষ্টারমশায় আমাকে ব'ল্‌লেন, "তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট ক'র্‌তে পার, ত্বঃখ নষ্ট ক'র্‌তে পার না। আমাদের বাংলা দেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ ত্বধ শুকিয়ে এসেচে। সেই মাতার ত্বধ তুমি তো অমন ক'রে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পার্‌বে না!"

এই সব কথা ভাব্‌বার কথা। স্থির ক'রেছিলুম্‌ এই ভাব্‌নাতেই প্রাণ দেবো। সেদিন বিমলকে এসে ব'ল্‌লুম্‌—"বিমল, আমাদের ত্ব'জনের জীবন দেশের ত্বঃখের মূলছেদনের কাজে লাগাবো।"

বিমল হেসে ব'ল্‌লে, "তুমি দেখ্‌চি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চ'লে যেয়ো না।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।"

এম্‌নি ক'রে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেলো। আসলে বিমল স্বভাবত, যাকে বলে, মহিলা। ও যদিও গরীবের ঘর থেকে এসেচে কিন্তু ও রাণী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখদুঃখ ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাক্‌বেই কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিঁকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড়ো ক'র্‌তে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে প'ড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেচে, যাতে-ক'রে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলিন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে র'য়েচে তাদের নীচ ব'লে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারিনে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক

যতো নাব্‌চে ভারতবর্ষই নাব্‌চে, তারা যতো ম'র্‌চে ভারতবর্ষই ম'র্‌চে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাইনি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড ক'রে তুলেচি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হ'য়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েচি বিমলকে জায়গা দিতে হ'বে ব'লে। তাতে ক'রে হ'য়েচে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েচি পরিয়েচি শিখিয়েচি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ ক'রেচি,—মানুষ যে কতো বড়ো, জীবন যে কতো মহৎ সে কথা স্পষ্ট ক'রে মনে রাখ্‌তে পারিনি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা ক'রেচেন আমার মাষ্টার-মশায়—তিনিই আমাকে যতটা পেরেচেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেচেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্ব্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম্। আশ্চর্য্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য্য ব'ল্‌চি এই জন্যে যে আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখ্‌তে পেয়েচেন সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনাপাওনার হিসাব করি তখন একদিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড়ো লোক্‌সান ধরা প'ড়ে, কিন্তু লোক্‌সান ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ ক'রেচেন তাঁর পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ হ'য়ে আমি স্বাধীন হ'য়েচি। আমি মাষ্টার-মশায়কে ব'ল্‌লুম্, "আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ ক'র্‌বেন না।"

তিনি ব'ল্‌লেন, "দেখ, তোমাকে আমি যা দিয়েচি তার দাম পেয়েচি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েচি তার দাম যদি নিই তাহ'লে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।"

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় ক'রে চন্দ্রনাথ বাবু আমাকে পড়াতে এসেচেন, কোনোমতেই আমাদের গাড়িঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পার্‌লুম্ না। তিনি ব'ল্‌তেন, "আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে আফিস ক'রে আমাদের মানুষ ক'রেচেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্চি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "না হয় আমাদের বিষয়কর্ম্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।"

তিনি ব'ল্‌লেন, "না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়ো মানুষীর ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাক্‌তে চাই।"

তাঁর ছেলে এখন এম্-এ পাস ক'রে চাক্‌রি খুঁজ্‌চে। আমি ব'ল্‌লুম্, আমার এখানে তার একটা কাজ হ'তে পারে। ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিলো। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিলো, সেখানে সুবিধে পায়নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আভাস দেয়। তখনি আমি উৎসাহ ক'রে

চন্দ্রনাথবাবুকে ব'ল্‌লুম্‌। তিনি ব'ল্‌লেন, "না, এখানে তা'র কাজ হবে না।"—তাকে এতো বড়ো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর খুব রাগ ক'রেচে। সে রেগে পত্নীহীন বুড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙ্গুনে চ'লে গেলো।

তিনি আমাকে বারবার ব'লেচেন,"দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত ক'র্‌লে পরমার্থের অপমান করা হয়।"

এখন তিনি এখানকার এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেড্‌মাষ্টারি করেন। এতোদিন তিনি আমাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত থাক্‌তেন না। এই কিছুদিন থেকে আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগারোটা দুপুর পর্য্যন্ত নানাকথায় কাটিয়ে আস্‌ছিলুম্‌। বোধ হয় ভাব্‌লেন, তাঁর ছোটো ঘর এই ভাদ্রমাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েচেন। আশ্চর্য্য এই, বড়ো মানুষের পরেও তাঁর গরীবের মতোই সমান দয়া, বড়ো মানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা ক'রেন না।

বাস্তবকে যতো একান্ত ক'রে দেখি ততোই সে আমাদের পেয়ে বসে—আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এতো বেঁশি তীব্র ক'রে তুলেচে যে, সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হ'বার জো হ'য়েচে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্চিনে। তাই

আজ আমার এতোটুকু ফাঁককে লোকলোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধ'রে গান গাইতে ব'সেচি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখ্‌তে পাই তখন ও-গানের মানে একেবারেই ব'দ্‌লে যায়, তখন

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়াঁয়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া?

যতো দুঃখ যতো ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবনভরে না নিয়ে দিনরাত এমন ক'রে কেমনে কাট্‌বে? আর তো পারিনে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভ'রে দাও!

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলা দেশের চিত্ত যে কেমন হ'য়ে গেলো তা ব'ল্‌তে পারিনে। ষাটহাজার সগর-সন্তানের ছাইয়ের পরে এক মুহূর্ত্ত যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ ক'র্‌লে। কতো যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে প'ড়ে ছিলো— কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না—সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা ক'য়ে উঠ্‌লো ব'ল্‌লে, "এই যে আমি!"

বইয়ে প'ড়েচি, গ্রীস্‌ দেশের কোন্‌ মূর্ত্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার ক'রেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রম-বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিলো কোথায়? সে যদি পাথরের মতো আঁট শক্ত জিনিষ হ'তো, তা হ'লেও তো বুঝ্‌তুম্‌—অহল্যা পাষাণীও তো একদিন মানুষ হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু এ যে সব ছ'ড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্ত্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলি গ'লে গ'লে পড়ে, বাতাসে উড়ে' উড়ে' যায়, এ যে রাশ হ'য়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিষ হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জ্জনে ব'লে উঠ্‌লো,—"অয়মহং ভোঃ!"

তাই আমাদের সেদিন মনে হ'লো, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মাণিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খ'সে প'ড়্‌লো; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্ত্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করেনি, যা কিনে আনিনি, কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেই জন্যে মনে হ'লো আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইলো না। কেবলি মনে হ'তে লাগ্‌লো, "এই হ'লো বলে', হ'লো বলে'!"

আমাদের সেদিন মনে হ'য়েছিলো ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পক-রথের মতো সে আপনি চ'লে আসে—অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না; তার খোরাকের জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্‌তি ক'রে দিতে হয়—আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত ক'র্‌তো। যেটা সাম্‌নে দেখা যাচ্চে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর-একটা-কিছুকে দেখ্‌তে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন ব'লেছিলেন, "সৌভাগ্য

হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায়, কেবল দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ ক'র্‌বার শক্তি আমাদের নেই; তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ ক'রে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।"

সন্দীপ ব'ল্‌লেন, "দেখো নিখিল, তুমি দেবতাকে মান না, সেইজন্যেই এমন নাস্তিকের মতো কথা কও। আমরা প্রত্যক্ষ দেখ্‌চি দেবী বর দিতে এসেচেন আর তুমি অবিশ্বাস ক'র্‌চো?"

আমার স্বামী ব'ল্‌লেন, "আমি দেবতাকে মানি সেই-জন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা আমরা জোটাতে পার্‌লুম্‌ না। বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।"

আমার স্বামীর এই রকমের কথায় আমার ভারি রাগ হ'তো। আমি তাঁকে ব'ল্‌তুম্‌, "তুমি মনে করো দেশের এই উদ্দীপনা, এ কেবলমাত্র নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?"

তিনি ব'ল্‌লেন, "শক্তি দেয় কিন্তু অস্ত্র দেয় না।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।"

স্বামী হেসে ব'ল্‌লেন, "কামার তো অম্‌নি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।"

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে ব'ল্‌লেন, "দাম দেবো গো দেবো!"

স্বামী ব'ল্‌লেন, "যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রসন-চৌকি বায়না দেবো।"

সন্দীপ ব'ল্‌লেন "তোমার বায়নার আশায় আমরা ব'সে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিন্‌তে হবে না।"

বলে' তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধ'র্‌লেন—

আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক কানন ঘুরে' ঘুরে'
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে ব'ল্‌লেন, "মক্ষিরাণী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাক্‌লেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ ক'রে দেবার জন্যেই গাইলুম্। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হাল্কা হ'য়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপূর গান এসে প'ড়েচে, এখন নিখিল ব'সে ব'সে গোড়া থেকে সারগম সাধ্‌তে থাকুক্, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুল্‌বো।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি,—
আমার প্রাণ বলে, তোর' যা আছে সব
যাক্ না উড়ে পুড়ে'।

আচ্ছা, না হয় আমাদের সর্ব্বনাশই হবে, তার বেশি তো নয়, রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক্ না চুকে,
সব হারাবো হাসিমুখে,
আমি এই চ'লেছি মরণসুধা
নিতে পরাণ পুরে।

আসল কথা হ'চ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেচে. আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টি'ক্‌তে পার্‌বো না, আমরা অসাধ্য-সাধনের পথে বেরিয়ে প'ড়্‌বো।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে!
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক্‌ ভেঙে-চুরে।

মনে হ'ল আমার স্বামীর কিছু ব'ল্‌বার আছে, কিন্তু তিনি ব'ল্‌লেন না, আস্তে আস্তে চ'লে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে প'ড়্‌লো, ঠিক এই জিনিষটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিলো। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আস্‌চে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর-গুর ক'র্‌চে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হ'তে লাগ্‌লো একটা কি পরমাশ্চর্য্য এসে প'ড়্‌লো ব'লে,—তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো এ'কে কোনো দিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা ক'রে ব'সে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি, এর জন্যে আমার তো কোনো

জবাবদিহি নেই! এতোদিন এক মনে আমি যার পূজা ক'রে এলুম্, বর দেবার বেলা এ যে এলো আর-এক দেবতা! তাই সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব'লে উঠেচে "বন্দেমাতরং"—আমার প্রাণ তেম্নি ক'রে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেচে "বন্দে—কোন্ অজানাকে, অপূর্ব্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে!"

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েচি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের ক্ষেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারো পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্-এক ভাবি সৃষ্টির ভ্রূণের মতো অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে র'য়েচে। আমি সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পেয়েচি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারি মতো একটি মেয়ে। সে ছিলো আপন আঙিনার কোণে—আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক প'ড়েচে। সে কিছুই ভাব্‌বার সময় পেলে না, সে চ'লেচে সাম্‌নের অন্ধকারে—একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি এই সুপ্ত-রাত্রে তার বুক কেমন ক'রে উঠ্‌চে প'ড়্‌চে। আমি জানি, যে-দূর থেকে বাঁশি ডাক্‌চে, ওর সমস্ত মন এম্‌নি ক'রে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হ'চ্ছে যেন পেয়েচি, যেন

পৌঁছেচি, যেন এখন চোক বুজে চ'ল্‌লেও কোন ভয় নেই। না, এতো মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধূলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েচে—কাজ ভুলেচে। এর কাছে কেবল অন্তহীন আবেগ—সেই আবেগে সে চলেচে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমিও ঘর হারিয়েচি, পথও হারিয়েচি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী রাত যখন রাঙা হ'য়ে পোহাবে তখন ফের্‌বার পথের যে চিহ্নও দেখ্‌তে পাবি নে! কিন্তু ফির্‌বো কেন, ম'র্‌বো। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজালো সে যদি আমার সর্ব্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে তবে আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে, আমার কণাও থাক্‌বে না, চিহ্নও থাক্‌বে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে, তার পরে কোথায় ভালো, কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি, কোথায় কান্না!

সেদিন বাংলাদেশে সময়ের কলে পূরো ইষ্টিম দেওয়া হ'য়েছিলো। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধাঁ ধাঁ ক'রে হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। বাংলা দেশের যে কোণে আমরা থাকি, এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না

এম্‌নি মনে হ'তে লাগ্‌লো। এতো দিন আমাদের এদিকে বাংলাদেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিলো। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারো উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি ব'ল্‌তেন, "দেশের নামে ত্যাগ যারা ক'র্‌বে তা'রা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা ক'র্‌বে তা'রা শত্রু; তা'রা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।"

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে ব'স্‌লেন তাঁর চেলারা চারদিক থেকে আনাগোনা ক'র্‌তে লাগ্‌লো, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হ'তে থাক্‌লো, তখন এখানেও ঢেউ উঠ্‌তে লাগ্‌লো। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে' গেলো। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলো যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাইরে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। এটা বেশ বোঝা গেলো, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ, সরল, সবল হওয়া বড়ো কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখে প'ড়্‌লো আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলাতি নুন, বিলাতি চিনি, বিলাতি কাপড় এখনো নির্ব্বাসিত হয় নি। এমন কি, আমার স্বামীর আম্‌লারা পর্য্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিষের আমদানি ক'রেছিলেন তখন এখানকার

ছেলে বুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসা-হাসি ক'রেছিলো। দিশি জিনিষের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্দ্ধার যোগ ছিলো না তখন তাকে আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা ক'রেচি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগ্‌ড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন—কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাইনি। বরঞ্চ তখন তাঁর ব'স্‌বার ঘরে আস্‌বাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ ক'রে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা আর কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হ'তো। আমার স্বামী হেসে ব'ল্‌তেন, "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অতো বিচলিত হ'চ্চো কেন?"

আমি ব'ল্‌তুম্, "ওরা যে আমাদের অসভ্য অজ্‌বুগ্ মনে ক'রে যাবে।"

তিনি ব'ল্‌তেন, "তা যখন মনে ক'র্‌বে তখন আমিও এই কথা মনে ক'র্‌বো ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্য্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্য্যন্ত পৌছয় নি।"

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি ক'রে ব্যবহার ক'র্‌তেন। কতোদিন কোনো সাহেব আস্‌বার খপর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙিন কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেচি।

আমার স্বামী ব'ল্‌তেন "দেখো বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেম্‌নি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি ক'রে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।"

তখন এ সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন, মেজোরাণী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে ব'ল্‌তেন, "ঠাকুরপো, শুনেচি আজকাল দিশি সাবান উঠেচে নাকি—আমাদের তো ভাই সাবান মাখার দিন উঠেই গেচে, তবে ওতে যদি চর্ব্বি না থাকে তাহ'লে মাখ্‌তে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হ'য়ে গেচে। অনেকদিন তো ছেড়েই দিয়েচি তবু সাবান না মেখে আজো মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমতো হ'লো না।"

এতেই আমার স্বামী ভারি খুসি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আস্‌তে লাগ্‌লো। সে কি সাবান, না সাজিমাটির ড্যালা! আমি বুঝি জানিনে? স্বামীর আমলে মেজোরাণী যে বিলিতি সাবান মাখ্‌তেন আজও সমানে তাই চ'ল্‌চে, একদিনও কামাই নেই; ঐ দিশি সাবানে তাঁর কাপড়কাচা চ'ল্‌তে লাগ্‌লো।

আর একদিন এসে ব'ল্‌লেন, "ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেচে, সে তো আমার চাই। মাথা খাও আমাকে এক বাণ্ডিল—"

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধ'রে যতো রকমের দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিলো সব মেজোরাণীর

ঘরে বোঝাই হ'তে লাগ্‌লো। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধা ছিলো না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিলো না ব'ল্‌লেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব সজ্‌নের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখ্‌চি লেখ্‌বার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালে ভদ্রে লেখার সখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপরে হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিইনে সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি ক'র্‌তেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা ব'ল্‌বার জো ছিলো না। ব'ল্‌তে গেলেই তিনি এমন মুখ ক'রে চুপ্‌ ক'রে থাক্‌তেন যে বুঝ্‌তুম্‌ যে উল্টো ফল হ'লো। এ সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠ'ক্‌তে হয়।

মেজোরাণী সেলাই ভালোবাসেন; একদিন যখন সেলাই ক'র্‌চেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে ব'ল্‌লুম্‌, "এ তোমার কি কাণ্ড! এদিকে তোমার ঠাকুরপোর সাম্‌নে দিশি কাঁচির নাম ক'র্‌তেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ওদিকে সেলাই ক'র্‌বার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না!"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "তাতে দোষ হ'য়েচে কি, কতো খুসি হয় বল্‌ দেখি? ছোটোবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েচি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারিনে। পুরুষ মানুষ, ওর আর তো কোনো নেশা নেই

—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্ব্বনেশে নেশা তুই—এইখানেই ও ম'জ্‌বে!"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "যাই বলো, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।"

মেজোরাণী হেসে উঠ্‌লেন, ব'ল্‌লেন, "ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেতকাঠির মতো—মেয়েমানুষ অতো সোজা নয়—সে নরম ব'লেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।"

মেজোরাণীর সেই কথাটি ভুল্‌বো না, "ওর এক সর্ব্বনেশে নেশা তুই, এইখানেই ও ম'জ্‌বে।"

আজ আমার কেবলি মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড়ো হাট। এখানে জোলার এধারে নিত্য বাজার বসে, আর জোলার ওধারে প্রতি-শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি ক'রে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হ'য়ে যাতায়াতের পথ সহজ হ'য়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলা দেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চ'ড়ে গেচে। আমাকে সন্দীপ এসে ব'ল্‌লেন, "এতো বড়ো হাট বাজার

আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী ক'রে তুল্‌তে হবে, এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।"

আমি কোমর বেঁধে ব'ল্‌লুম্, "চাই বইকি।"

সন্দীপ ব'ল্‌লেন, "এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথাকাটাকাটি হ'য়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠ্‌লুম্ না। ও বলে, বক্তৃতা পর্য্যন্ত চ'ল্‌বে কিন্তু জবরদস্তি চ'ল্‌বে না।"

আমি একটু অহঙ্কার ক'রেই ব'ল্‌লুম্, "আচ্ছা, সে আমি দেখ্‌চি।"

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কতো গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাক্‌তো তাহ'লে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবী ক'র্‌তে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেতো। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কতো! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী! তিনি তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার-বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েচেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন;—তিনি বলেন, "আমরা বৈষ্ণবতন্ত্রের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌বার জন্যেই এতো ব্যাকুল হ'য়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখ্‌তে পাই তখনি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কি। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এক-একদিন গান ধ'রতেন,—

যখন দেখা দাওনি রাধা তখন বেজেছিলো বাঁশি !
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেলো ভাসি !
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠ্‌লো হাসি'।

এই সব শুন্‌তে শুন্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম্ যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ ক'র্‌চি তাকেই নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'র্‌চি :—নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রেছি আমার এই জগৎকে, আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এতো সোনা ছিলো না, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমি নূতন ক'র্‌চি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে, ঐ আমার ভক্তকে,—ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব্ব প্রতিভাকে ;—আমি যে স্পষ্ট অনুভব ক'র্‌চি, ওর মধ্যে প্রতিক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্চি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সে দিন অনেক অনুরোধ ক'রে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন, একদণ্ড পরেই আমি দেখ্‌তে পেলুম্, তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্ব'লে উঠ্‌লো, বুঝ্‌লুম্ সে আদ্যাশক্তিকে দেখ্‌তে পেয়েচে, বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ ওর রক্তের মধ্যে আমারি সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হ'য়েচে। পর-দিন সন্দীপ আমাকে এসে ব'ল্‌লেন, "এ কি মন্ত্র তোমার, ও বালক তো আর সেই বালক নেই, ওর পল্‌তেয় এক মুহূর্ত্তে

শিখা ধ'রে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌বে কে ? একে একে সবাই আস্‌বে। একটি একটি ক'রে প্রদীপ জ্ব'ল্‌তে জ্ব'ল্‌তে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগ্‌বে !”

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হ'য়েই আমি মনে মনে ঠিক ক'রেছিলুম্‌, ভক্তকে বরদান ক'র্‌বো। আর এও আমার মনে ছিলো আমি যা চাইবো তাকে কেউ ঠেকাতে পার্‌বে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে' ফেলে আমি নতুন ক'রে চুল বাঁধ্‌লুম্‌। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে এক রকম খোঁপা বাঁধ্‌তে শিখিয়েছিলেন আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাস্‌তেন, তিনি ব'ল্‌তেন “ঘাড় জিনিষটা যে কতো সুন্দর হ'তে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না ক'রে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন,—কবি হয় তো ব'ল্‌তেন, পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, যেন মশাল, তার উর্দ্ধে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে' উঠেচে।” এই ব'লে তিনি আমার সেই চুল-তোলা ঘাড়ের উপর—হায় রে সে কথা আর কেন ?

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম্‌। আগে এমন ছোটো-খাটো সত্য মিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক্‌ প'ড়্‌তো—কিছুদিন থেকে ডাক্‌বার সব উপলক্ষ্যই বন্ধ হ'য়ে গেছে ;—বানাবার শক্তিও নেই।

নিখিলেশের আত্মকথা

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে ম'রেচে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে। সমাজ হিসেব ক'রে ব'লেচে খরচ লাগ্‌বে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ ক'রে ব'ল্‌লুম্‌, "নাই বা ক'র্‌লি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের?"

সে ক্লান্ত গরুর মতো তার ধৈর্য্যভারপূর্ণ চোখ তুলে ব'ল্‌লে, "মেয়েটি আছে বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও তো গতি করা চাই।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "পাপই যদি হ'য়ে থাকে, এতোদিন ধ'রে তার প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয় নি!"

সে ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে কম কি! ডাক্তার-খরচায় জমি-জমা কিছু বিক্রী আর বাকী সমস্ত বন্ধক প'ড়ে গেচে। কিন্তু দান-দক্ষিণে ব্রাহ্মণ-ভোজন না হ'লে তো খালাস পাইনে।"

তর্ক ক'রে কি হবে? মনে মনে ব'ল্‌লুম্‌, "যে-ব্রাহ্মণ ভোজন করে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে?"

একে তো পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁসে কাটিয়েচে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে প'ড়্‌লো। এই সময়ে কোনো রকম ক'রে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর

চেলাগিরি সুরু ক'র্‌লে। তাতে হ'লো এই, তার ছেলে-মেয়েরা যে খেতে পাচ্চে না সেইটে ভুলে থাক্‌বার একটা নেশায় সে ডুবে রইলো। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না—সুখ যেমন নেই তেম্‌নি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলে মেয়ে চারিটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে, সে বৈরাগী হ'য়ে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

এ সব কথা আমি কিছুই জান্‌তুম্ না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চ'ল্‌ছিলো। মাষ্টারমশায় যে পঞ্চুর ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ ক'র্‌চেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বৌকে নিয়ে রেঙ্গুন চ'লে গেছে; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এম্‌নি ক'রে একমাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকাল বেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেচে। যখন তার বড়ো ছেলে মেয়ে দু'টি তার কোলের কাছে মাটির উপর ব'সে তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "বাবা তুই কোথায় গিয়েছিলি", সব-ছোটো ছেলেটি তার কোল দখল ক'রে ব'স্‌লে, আর সেজো মেয়েটি পিঠের উপর প'ড়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'র্‌লে, তখন কান্নার পর কান্না, কিছুতে তার কান্না থাম্‌তে চায় না। ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "মাষ্টার বাবু, এগুলোকে দু'বেলা পেট ভরে' খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মার্‌বো সে মুক্তিও নেই, এমন ক'রে বেঁধে মার কেন? আমি কি পাপ ক'রেছিলুম্?"

এদিকে যে ব্যবসাটুকু ধ'রে কোনোমতে তার দিন চ'ল্‌ছিলো তার সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ যে মাষ্টার-মশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে, সেইটেকেই সে টেনে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো, তার নিজের বাড়িতে ন'ড়্‌বার নাম ক'র্‌তে চায় না। শেষকালে মাষ্টার মশায় তাকে ব'ল্‌লেন, "পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও নইলে তোমার ঘর তুয়ারগুলো নষ্ট হ'য়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্চি, তুমি কাপড়ের ব্যবসা ক'রে অল্প অল্প ক'রে শোধ দিয়ো।"

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হ'লো— মনে ক'র্‌লে দয়াধর্ম্ম ব'লে একটা জিনিষ জগতে নেই। তারপরে টাকাটা নেবার বেলায় মাষ্টার মশায় যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাব্‌লে, শোধ তো ক'র্‌তে হবে, এমন উপকারের মূল্য কি! মাষ্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান ক'রে ভিতরের দিকে ঋণী ক'র্‌তে নিতান্ত নারাজ—তিনি বলেন, "মনের ইজ্জৎ চ'লে গেলে মানুষের জাত মারা হয়।"

হ্যাণ্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাষ্টার মশায়কে খুব বড়ো ক'রে প্রণাম ক'র্‌তে আর পার্‌লে না, পায়ের ধূলোটা বাদ প'ড়্‌লো। মাষ্টার মশায় মনে মনে হাস্‌লেন, তিনি প্রণামটা খাটো ক'র্‌তে পার্‌লেই বাঁচেন। তিনি বলেন, "আমি শ্রদ্ধা ক'র্‌বো আমাকে শ্রদ্ধা ক'র্‌বে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি, ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।"

পঞ্চু কিছু ধুতি সাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে

চাষীদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগ্‌লো। নগদ দাম পেতো না বটে, তেম্‌নি কিছু ধান কিছু বা পাট কিছু বা অন্য ফসল, যা হাতে হাতে আদায় ক'রে আন্‌তো সেটা দামে কাটা যেতো না। দু'মাসের মধ্যেই সে মাষ্টার মশায়ের এককিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ ক'রে দিলে এবং এই ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান্‌ প'ড়্‌লো। পঞ্চু নিশ্চয় মনে ক'র্‌তে লাগ্‌লো, মাষ্টার মশায়কে সে যে একদিন গুরু ব'লে ঠাউরেছিলো, ভুল ক'রেছিলো, লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এই রকমে পঞ্চুর দিন চ'লে যাচ্ছিলো। এমন সময় স্বদেশীর বান খুব প্রবল হ'য়ে এসে প'ড়্‌লো। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে প'ড়্‌তো তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এলো, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে; তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি ক'রে স্বদেশী প্রচারে মেতে উঠ্‌লো। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এন্ট্রেন্স পাস ক'রে গেছে, অনেককেই আমি কল্‌কাতায় প'ড়্‌বার বৃত্তি দিয়েচি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। ব'ল্‌লে "আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "সে আমি পার্‌বো না!"

তারা ব'ল্‌লে, "কেন, আপনার লোক্‌সান হবে?"

বুঝ্‌লুম্‌ "কথাটা আমাকে একটু অপমান ক'রে ব'ল্‌বার

জন্যে। আমি ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম্, "আমার লোক্‌সান নয়, গরীবের লোক্‌সান।"

মাষ্টার মশায় ছিলেন, তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "হাঁ, ওঁর লোক্‌সান বই কি, সে লোক্‌সান তো তোমাদের নয়!"

তারা ব'ল্‌লে, "দেশের জন্যে—"

মাষ্টার মশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে ব'ল্‌লেন, "দেশ ব'ল্‌তে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তা তোমরা কোনোদিন একবার চোকের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেচো? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে প'ড়ে এরা কি নুন খাবে, আর কি কাপড় প'র্‌বে তাই নিয়ে অত্যাচার ক'র্‌তে এসেচো, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেবো কেন?"

তারা ব'ল্‌লে, "আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন চিনি, দিশি কাপড় ধ'রেচি!"

তিনি ব'ল্‌লেন, "তোমাদের মনে রাগ হ'য়েচে, জেদ হ'য়েচে, সেই নেশায় তোমরা যা ক'র্‌চো খুসি হ'য়ে ক'র্‌চো —তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু'পয়সা বেশী দিয়ে দিশি জিনিষ কিন্‌চো, তোমাদের সেই খুসিতে ওরা তো বাধা দিচ্চে না! কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্চো সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানা-টানিতে পড়ে' ওদের শেষ-নিশ্বাস পর্য্যন্ত ল'ড়্‌চে কেবলমাত্র কোনোমতে টিঁকে থাক্‌বার জন্যে—ওদের কাছে দু'টো পয়সার দাম কতো সে তোমরা কল্পনাও ক'র্‌তে পারো না,— ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর

তোমরা এক-কোঠায় ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেচে —আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো এ'কে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যতদূর পর্য্যন্ত পার করো, মরণ পর্য্যন্ত, আমি বুড়োমানুষ, নেতা ব'লে তোমাদের নমস্কার ক'রে পিছনে পিছনে চ'ল্‌তে রাজি আছি, কিন্তু ঐ গরীবদের স্বাধীনতা দলন ক'রে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয় পতাকা আস্ফালন ক'রে বেড়াবে, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো, তাতে ম'র্‌তে হয় সেও স্বীকার!"

তারা প্রায় সকলেই মাষ্টার মশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা ব'ল্‌তে পার্‌লো না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হ'য়ে বুকের মধ্যে ফুট্‌তে লাগ্‌লো। আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ ক'রেচে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কি আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য ক'র্‌বো।"

এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা-হাসি হেসে ব'ল্‌লে, "কি আনুকূল্যটা ক'র্‌চেন?

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "দিশি মিল্‌ থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েচি—এমন কি, অন্য এলাকার হাটেও আমার সুতো পাঠাই—"

সে ছাত্রটি ব'লে উঠ্‌লো, "কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেচি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিন্‌চে না।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয় ; তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।"

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন, "শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েচে তারা বিব্রত ক'র্‌বারই ব্রত নিয়েচে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয়নি এমন জোলাকে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয়নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কি উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে, আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়! অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস ক'র্‌বে ওরা, আর উপবাসের পারণ ক'র্‌বে তোমরা!"

সায়ান্স ক্লাসের ছাত্রটি ব'ল্‌লে, "আচ্ছা বেশ উপবাসের কোন্‌ অংশটা আপনারাই নিয়েচেন শুনি!"

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন, "শুন্‌বে? দিশি মিল্‌ থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিন্‌তে হ'চ্চে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্চে, তাঁতের ইস্কুল খুলে ব'সেচে, তারপরে বাবাজির যে রকম ব্যবসা-বুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরী হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিঙ্‌খাবের টুক্‌রোর মতো ; সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর ব'স্‌বার ঘরের পর্‌দা খাটাবেন, সে পর্দ্দায় ওঁর ঘরের আব্রু থাক্‌বে না ; ততোদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয়, তখন দিশি কারুকার্য্যের নমুনা দেখে

তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাস্‌বে; আর, কোথাও যদি সেই রঙীন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।"

এতোদিন ওঁর কাছে আছি, মাষ্টার মশায়ের এমনতর শান্তিভঙ্গ হ'তে আমি কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জ'মে আস্‌চে—সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন ব'লে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় ক'রে দিয়েচে।

মেডিকাল-কলেজের ছাত্র ব'লে উঠ্‌লো, "আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা ক'র্‌বো না। তা হ'লে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "না সরাবো না, কারণ, সে মাল আমার নয়।"

এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে ব'ল্‌লে, "কারণ, তাতে আপনার লোক্‌সান আছে?"

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন, "হাঁ, তাতে ওঁর লোক্‌সান আছে, সুতরাং সে উনিই বুঝ্‌বেন।"

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চস্বরে "বন্দেমাতরং" ব'লে চীৎকার ক'রে বেরিয়ে গেলো।

এর কিছুদিন পরে মাষ্টার মশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কি?

ওদের জমিদার হরিশকুণ্ডু পঞ্চুকে একশো টাকা জরিমানা ক'রেচে।

কেন, ওর অপরাধ কি ?

ও বিলিতি কাপড় বেচেচে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে ব'ল্‌লে, "পরের কাছে ধার-করা টাকার কাপড় ক'খানা কিনেচি, এইগুলো বিক্রী হ'য়ে গেলেই এমন কাজ আর কখনো ক'র্‌বো না"। জমিদার ব'ল্‌লে, "সে হ'চ্চে না, আমার সাম্‌নে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্‌ তবে ছাড়া পাবি।" ও থাক্‌তে না পেরে হঠাৎ ব'লে ফেল্‌লে, "আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরীব ; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন।" শুনে জমিদার লাল হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লে, "হারামজাদা, কথা কইতে শিখেচো বটে, —লাগাও জুতি !" এই ব'লে এক চোট অপমান তো হ'য়েই গেলো, তার পরে একশো টাকা জরিমানা ! এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার ক'রে বেড়ায় "বন্দেমাতরং" ! এরা দেশের সেবক !

কাপড়ের কি হ'লো ?

পুড়িয়ে ফেলেচে।

সেখানে আর কে ছিলো ?

লোকের সংখ্যা ছিলো না, তারা চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো "বন্দেমাতরং"। সেখানে সন্দীপ ছিলেন তিনি এক মুঠো ছাই তু'লে নিয়ে ব'ল্‌লেন, "ভাই সব, বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টি-সৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন

জ্ব'ল্‌লো—এই ছাই পবিত্র—এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্‌-চেষ্টারের জাল কেটে ফেলে, নাগা সন্ন্যাসী হ'য়ে তোমাদের সাধনা ক'র্‌তে বেরোতে হবে !"

আমি পঞ্চুকে ব'ল্‌লুম্‌, "পঞ্চু তোমাকে ফৌজদারী ক'র্‌তে হবে।"

পঞ্চু ব'ল্‌লে, "কেউ সাক্ষী দেবে না।"

কেউ সাক্ষী দেবে না ? সন্দীপ ! সন্দীপ !

সন্দীপ তা'র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব'ল্‌লে, "কি, ব্যাপারটা কি ?"

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সাম্‌নে পুড়িয়েচে, তুমি সাক্ষী দেবে না ?

সন্দীপ হেসে ব'ল্‌লে, "দেবো বই কি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কি ! সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে !"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "যেটা ঘ'টেচে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য ?"

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "অন্য সত্যটা কি ?"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "যেটা ঘটা দরকার। সে সত্যকে আমাদের গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হ'চ্চে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি ক'র্‌তে এসেচে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।"

অতএব-

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষী বলো আমি সেই মিথ্যে সাক্ষী দেবো। যারা রাজ্য বিস্তার ক'রেচে, সাম্রাজ্য গ'ড়েচে, সমাজ বেঁধেচে, ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন ক'রেচে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এসেচে। যারা শাসন ক'র্‌বে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মান্‌বে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড়োনি? তোমরা কি জানো না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হ'চ্চে সেখানে মস্‌লাগুলো সব মিথ্যে!

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হ'য়েচে এখন—

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধ'রে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ ক'র্‌বে, ব'ল্‌বে তোমাদের সুবিধার জন্যেই; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ ক'র্‌তে থাক্‌বে, ব'ল্‌বে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ ক'রে তোল্‌বার সদভিপ্রায়ে; তোমরা সাধু হ'য়ে অশ্রুপাত ক'র্‌তে থাক্‌বে, আর আমরা অসাধু হ'য়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত ক'রে বানাবো। তোমাদের অশ্রু টিঁক্‌বে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টিঁক্‌বে।

মাষ্টার মহাশয় ব'ল্‌লেন, "এসব তর্ক ক'র্‌বার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে, একথা যে-লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না ক'র্‌তে পারে, সে লোক কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'রবে যে সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন

ক'রে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিষকে স্তূপাকার ক'রে তোলা লক্ষ্য নয়।"

সন্দীপ হেসে উঠে ব'ল্‌লে, "আপনার এ কথা মাষ্টার মশায়ের মতো কথাই হ'য়েছে! এ সকল কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখ্‌চি বাইরের জিনিষকে স্তূপাকার ক'রে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়োরকম ক'রে সাধন ক'রেচে তারা ব্যবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই-জাহাজ আর মাছি যেমন ক'রে সন্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে, তাদের ধর্ম্মপ্রচারকেরা তেম্‌নি ক'রে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য—আমি যখন কন্‌গ্রেসের দলে ছিলুম্ তখন আমি বাজার বুঝে আধসের সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেচি—আজও আমি এই ধর্ম্মনীতিকেই সার জেনেচি যে সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হ'চ্চে ফললাভ।

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন, "সত্যফল লাভ।"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "হাঁ সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধূলো ক'রে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর যা সত্য যা আপ্‌নি জন্মায় সে হ'চ্চে আগাছা, কাঁটাগাছ তার থেকেই যারা ফলের আশা ক'রে তারা কীটপতঙ্গের দল।"

এই ব'লেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চ'লে গেলো। মাষ্টার মশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, "জানো নিখিল, সন্দীপ অধার্ম্মিক নয় ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ, চাঁদই বটে কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে প'ড়েচে।"

আমি ব'ল্লুম্, "সেই জন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি ক'রেচে, আরো ক'র্বে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা ক'র্তে পারিনে।"

তিনি ব'ল্লেন, "সে আমি ক্রমে বুঝ্তে পার্চি। আমি অনেকদিন আশ্চর্য্য হ'য়ে ভেবেচি, সন্দীপকে এতোদিন তুমি কেমন ক'রে সহ্য ক'রে আছো। এমন কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হ'য়েচে এর মধ্যে তোমার দুর্ব্বলতা আছে। এখন দেখ্তে পাচ্চি ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই কিন্তু ছন্দের মিল র'য়েচে।"

আমি কৌতুক ক'রে ব'ল্লুম্, "মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর! হয়তো আমাদের ভাগ্যকবি প্যারাডাইস্ লষ্ট-এর মতো একটা এপিক লেখ্বার সঙ্কল্প ক'রেচেন।

মাষ্টারমশায় ব'ল্লেন, "এখন পঞ্চুকে নিয়ে কি করা যায়?"

আমি ব'ল্লুম্, "আপনি ব'ল্ছিলেন, যে-বিঘেকয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেকদিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জ'ন্মেছে, সেই স্বত্ব কাটিয়ে দেবার জন্যে ওর

জমিদার অনেক চেষ্টা ক'র্‌চে—ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেই-খানেই ওকে আমার প্রজা ক'রে রেখে দিই।"

আর একশো টাকার জরিমানা?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে? জমি যে আমার হবে।

আর ওর কাপড়ের বস্তা?

আমি আনিয়ে দিচ্চি। আমার প্রজা হ'য়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক্, দেখি ওকে কে বাধা দেয়?

পঞ্চু হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌লে, "হুজুর রাজায় রাজায় লড়াই,—পুলিশের দারগা থেকে উকিল ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত শকুনি গৃধিনীর পাল জ'মে যাবে, সবাই দেখে আমোদ ক'র্‌বে কিন্তু ম'র্‌বার বেলায় আমিই ম'র্‌বো।

কেন তোর কি ক'র্‌বে?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলে মেয়ে সুদ্ধু নিয়ে পুড়্‌বো।

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন, "আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাক্‌বে, তুই ভয় করিস্‌'নে—তোর ঘরে ব'সে তুই যেমন ইচ্ছে ব্যবসা কর্, কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হ'তে দেবো না। যতো সইবো, বোঝা ততোই বাড়্‌বে।"

সেই দিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেষ্ট্রী ক'রে আমি দখল ক'রে ব'স্‌লুম্। তার পর থেকে ঝুটোপুটি চ'ল্‌লো।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারেশ কেউ ছিলো না, এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবী ক'রে তার পুঁটুলি, তার প্যাট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক্ হ'য়ে ব'ল্‌লে, "আমার মামী তো বহুকাল হ'লো মারা গেছে।"

তার উত্তর, প্রথম-পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয়-পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী ম'রেচে, দ্বিতীয়-পক্ষের তো সময় ছিলো না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার ক'র্‌লে দ্বিতীয় পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয় মৃত্যুর পূর্ব্বের। সতীনের ঘর ক'র্‌বার ভয়ে বাপের বাড়ী ছিলো, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চ'লে যায়; কুণ্ডুজমিদারের আম্‌লারা এসব কথা কেউ কেউ জানে, বোধ করি প্রজাদেরও কারো কারো জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময়ে যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিলো তারাও বেরিয়ে আস্‌তে পারে।

সেদিন দুপুর-বেলা পঞ্চুর এই দুগ্রহ নিয়ে যখন আমি খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চ'ম্‌কে উঠ্‌লুম্, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "কে ডাক্‌চে?" ব'ল্‌লে "রাণীমা।"

বড়ো রাণীমা ?

না, ছোটো রাণীমা।

ছোটোরাণী ? মনে হ'লো একশো বছর ছোটোরাণী আমাকে ডাকেনি।

বৈঠকখানা ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চ'ল্‌লুম্‌। শোবার ঘরে গিয়ে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য্য হলুম্‌; যখন দেখা গেল, সর্ব্বাঙ্গে, বেশি নয়, অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখিনি, সব এমন এলোমেলো হ'য়ে গিয়েছিলো যে, মনে হ'তো যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে। ওরি মধ্যে আগেকার মতো আজ একটু পারিপাট্য দেখ্‌তে পেলুম্‌।

আমি কিছু না ব'লে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম্‌। বিমলার মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠ্‌লো, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে ব'ল্‌লে, "দেখো, সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাট্‌টার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আস্‌চে, এটা কি ভালো হ'চ্চে ?"

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "কি ক'র্‌লে ভালো হয় ?"

ঐ জিনিষগুলো বের ক'রে দিতে বলো না !

জিনিষগুলো তো আমার নয় !

কিন্তু হাট তো তোমার ?

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিষ কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিষ কিনুক্ না।

যদি কেনে তো আমি খুসি হবো, কিন্তু যদি না কেনে?

সে কি কথা? ওদের এতো আস্পর্দ্ধা হবে? তুমি হ'লে—

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? আমি অত্যাচার ক'র্‌তে পার্‌বো না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে,—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা। সে কথা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

এই ব'লে আমি চ'লে এলুম্। হঠাৎ আমার চোখের সাম্‌নে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হ'য়ে উঠ্‌লো। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চ'লে গেছে, সে যে আপনার জীব-পালনের সমস্ত কাজ ক'রেও, আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্য্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিন রাত্রিকে জপমালার মতো ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চ'লেচে, সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব ক'র্‌লুম্। কর্ম্মভারের সীমা নেই অথচ মুক্তিবেগেরও সীমা নেই! কেউ বাঁধ্‌বে না,—কেউ বাঁধ্‌বে না, কিছুতেই বাঁধ্‌বে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ ক'র্‌লে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, হঠাৎ তোমার এ

হ'লো কি ? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেলো না, তার পরে পরিষ্কার বুঝ্‌লুম্‌, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েচে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেলো। আমি ভারি আশ্চর্য্য হ'লুম্‌ আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিলো না। ফটোগ্রাফের প্লেটে যে রকম ক'রে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেম্‌নি ক'রে অঙ্কিত হ'লো। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম্‌ বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় ক'র্‌বার জন্যে বিশেষ ক'রে সাজ ক'রেছে। আজকের দিনের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমি কখনই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাৎ ক'রে দেখিনি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী ব'লেই দেখ্‌লুম্‌—শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিলো, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ ;—কিন্তু বিমলা দেশের নাম ক'রে যে কথাগুলো ব'ল্‌চে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়,—এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ ক'রে দেখ্‌লুম্‌, লেশমাত্র কুয়াসা কোথাও ছিলো না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম্‌, তখন একদল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায়

অকস্মাৎ কি কারণে ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েচে ; বারান্দার সাম্‌নে দক্ষিণে খোয়া-ফেলা রাস্তার তুইধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপী ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত ক'রে দিয়েছে ; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তু'লে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে আছে, তা'রই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা ঘাস খাচ্চে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে প'ড়ে আছে, আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার ক'র্‌চে—আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেচে। আজ আমার মনে হ'লো, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারি স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে ব'সেচি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে প'ড়্‌চে। আমার মনে হ'লো আমি আছি এবং সমস্তই আছে, এই তুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সঙ্গীত বাজ্‌চে সে কি উদার, কি গভীর, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর!

তার পরে মনে প'ড়্‌লো, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আট্‌কা-পড়া পঞ্চু ; সেই পঞ্চুকে যেন দেখ্‌লুন্ আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে প'ড়ে আছে—কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরীব রায়তের প্রতিমূর্ত্তি। দেখ্‌তে পেলুম্ পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশকুণ্ডু। সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন

বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দীঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বুদ্বুদ উদ্গার ক'র্‌চে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-একদিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হ'য়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত ক'রে প'ড়ে আছে, শেষ পর্য্যন্ত তা'র সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে হবে,—এই কাজটা মুলতবি হ'য়ে প'ড়ে র'য়েচে শত শত বৎসর ধ'রে। আমার মোহ ঘুচুক্‌, আমার আবরণ কেটে যাক্‌, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হ'য়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন! আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সাম্‌নের দিকে ছুটে চ'লে যাবো, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার ক'রে আন্‌তে হবে—যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরী ক'রে দিচ্চে সেই আমাদের সহধর্ম্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুন্‌চে, তা'র ছদ্মবেশ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে তা'র মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই,—তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা ভঙ্গ ক'র্‌তে না পাঠাই! আজ আমার মনে হ'চ্চে আমার জয় হবে,—আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েচি, সহজ চোখে সব দেখ্‌চি—আমি মুক্তি পেয়েচি, আমি মুক্তি দিলুম্‌, যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়ীগুলা আবার এক-একদিন টন্‌টন্ ক'রে উঠ্‌বে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েচি—তাকে আমি আর শ্রদ্ধা ক'র্‌তে পার্‌বো না। আমি জানি সে কেবলমাত্রই আমার—তার দাম কিসের? যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও,—কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিওনা ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে। আমাকে একলা পথের পথিক যদি করো সে পথ তোমারই পথ হোক্—আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেচে আজ!

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আন্‌লে কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হ'লো না, তার দুই চোখ ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। বুঝ্‌লুম্ নিখিলের কাছে কোনো ফল পায়নি। যেমন ক'রে হোক ফল পাবে সেই অহঙ্কার ওর মনে ছিলো কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিলো না। পুরুষেরা যেখানে দুর্ব্বল, মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো ক'রেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ ক'র্‌তে পারে না। আসল কথা, পুরুষ, মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে, পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে, তাহ'লে এই দু'টো জাতের ভেদ জিনিষটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাৎ একটা অপব্যয় হ'তো!

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘ'ট্‌লো না কেন, সে হিসেব মনে নেই, কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম্ সেটা কেন ঘ'ট্‌লো না এইটেই হ'লো খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কতো রঙ কতো ভঙ্গী, কতো কান্না, কতো ছল, কতো হাবভাব, তার আর অন্ত নেই; ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তি-বিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি ক'র্‌ছিলেন তখন

ছিলেন তিনি ইস্কুলমাষ্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব; আর ওদের বেলা তিনি মাষ্টারিতে জবাব দিয়ে হ'য়ে উঠেচেন আর্টিষ্ট; তখন তুলি আর রঙের বাক্স!

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্য্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো সে আমার ভারি মিষ্টি দেখ্‌তে লাগ্‌লো। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধ'র্‌লুম্; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লুম্, "মক্ষি, আমরা দু'জনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। ব'সো তুমি।"

এই ব'লে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম্। আশ্চর্য্য! এতোখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেলো। বর্ষার যে পদ্মা ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে ডাক্‌তে ডাক্‌তে আস্‌চে, মনে হয় সাম্‌নে কিছু-আর রাখ্‌বে না, সে হঠাৎ একটা-জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এপার থেকে ওপারে চ'লে গেলো। তার তলার দিকে কোথায় কি বাধা লুকিয়ে ছিলো মকরবাহিনী নিজেও তা জান্‌তো না। আমি বিমলার হাত চেপে ধ'রলুম্, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো; কিন্তু ঐ অস্থায়ীতেই কেন থেমে গেলো, অন্তরা পর্য্যন্ত কেন পৌঁছলো না? বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হ'য়ে গেছে, ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হ'য়ে বয় তখন সেই

তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়! ভিতরে একটা সঙ্কোচ কোথাও রয়ে' গেচে, সেটা কি? যে কোনো-একটা জিনিষ নয়, সে অনেক-গুলোতে জড়ানো! সেই জন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারিনে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেই জন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফে'ল্‌লেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হ'য়ে যেতো।

চৌকিতে ব'সে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। মনে মনে সে বুঝ্‌লে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেলো। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ ক'রে চ'লে গেলো কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌লো। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে ব'ল্‌লুম্ বাধা আছে কিন্তু তা নিয়ে খেদ ক'র্‌বো না, লড়াই ক'র্‌বো! কি বলো রাণী।

বিমলা একটু কেসে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে শুধু ব'ল্‌লে, "হাঁ"।

আমি ব'ল্‌লুম্, "কি ক'রে কাজটা আরম্ভ ক'র্‌তে হবে তারি প্ল্যান্‌টা একটু স্পষ্ট ক'রে ঠিক ক'রে নেওয়া যাক্।"

ব'লে আমি আমার পকেট থেকে পেন্সিল কাগজ বের ক'রে নিয়ে ব'স্‌লুম্। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-

সব ছেলে এসে প'ড়েচে তাদের মধ্যে কি রকম কাজের বিভাগ ক'রে দিতে হবে তারি আলোচনা ক'র্‌তে লাগ্‌লুম্‌—এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা ব'লে উঠ্‌লো, এখন থাক্‌, সন্দীপ বাবু, আমি পাঁচটার সময় আস্‌বো, তখন সব কথা হবে। এই ব'লেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলো।

বুঝ্‌লুম্‌, এতক্ষণ চেষ্টা ক'রে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পার্‌ছিলো না; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় প'ড়ে ওকে কাঁদ্‌তে হবে।

বিমলা চ'লে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরও বেশি মাতাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙীন হ'য়ে ওঠে, তেম্‌নি বিমলা চ'লে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। মনে হ'তে লাগ্‌লো ঠিক সময়টাকে ব'য়ে যেতে দিয়েচি। এ কি কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার পরে অবজ্ঞা ক'রেই চ'লে গেলো! ক'র্‌তেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'র্‌চে এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হ'লো তাকে এখন বিদায় ক'রে দিই,—কিন্তু মন স্থির ক'র্‌বার পূর্ব্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে প'ড়্‌লো।

তারপর নুন চিনি কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনি ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেলো। মনে হ'লো স্বপ্ন থেকে জাগ্‌লুম্। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম্। তার পরে চলো রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেচে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তর টিপুনি দিচ্চে! মাড়োয়ারিরা ব'ল্‌চে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচ্‌তে দিন, নইলে ফতুর হ'য়ে যাবো। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মান্‌চে না।

একটা চাষী তার ছেলে মেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্ম্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিলো, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েচে। তাই নিয়ে গোলমাল চ'ল্‌চে। আমরা তাকে ব'ল্‌চি তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্চি, কিন্তু সস্তাদামের দিশি গরম কাপড় কোথায়? রঙীন কাপড় তো দেখিনে। কাশ্মিরী শাল তো ওকে কিনে দিতে পারিনে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে প'ড়েচে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ ক'র্‌বার হুকুম দিয়েচেন। নালিশের ঠিকমতো তদ্বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েচে, এমন কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হ'চ্ছে, যার কাপড় পোড়াবো তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে,

তাহ'লে তার টাকা পাই কোথায়? আর ঐ পুড়্তে পুড়্তে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা যে গরম হ'য়ে উঠ্বে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড়-ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হ'য়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াতো তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যবসার খুব উন্নতি হ'য়েছিলো।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই. সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে প'ড়েচে এখন বিলিতি শাল র‍্যাপার মেরিনো রাখ্বো কি তাড়াবো?

আমি ব'ল্লুম্, "যে লোক বিলিতি কাপড় কিন্বে তাকে দিশি কাপড় বখ্শিশ দেওয়া চ'ল্বে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মাম্লা যারা ক'র্তে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেবো, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য অমন চ'ম্কে উঠ্লে চ'ল্বে না। চাষীর খোলায় আগুন দিয়ে রোসনাই করায় আমার সখ নেই। কিন্তু এ হ'লো যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তাহ'লে মধুর রসে ডুব মারো, রাধাভাবে ভোর হ'য়ে ক ব'ল্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।

আর বিলিতি গরম কাপড়? যতো অসুবিধেই হোক্ ও কিছুতেই চ'ল্বে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা ক'র্তে পার্বো না। বিলিতি রঙীন র‍্যাপার যখন ছিলোনা তখন চাষীর ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাতো এখনো তাই ক'র্বে। তাতে তাদের সখ মিট্বে না জানি, কিন্তু সখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য ক'র্‌বার পথে কতকটা আনা গেছে! তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হ'চ্চে মির্‌জান, সে কিছুতেই নরম হ'লো না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেলো ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পারো কিনা? সে ব'ল্‌লে, সে আর শক্ত কি, পারি কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়্‌বে না?—আমি ব'ল্‌লুম্‌, দায়টাকে কারো ঘাড়ে প'ড়্‌বার মতো আল্‌গা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু—নিতান্তই যদি পড়-পড় হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেবো।

হাট হ'য়ে গেলে মির্‌জানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিলো। মাঝিও ছিলো না। নায়েব কৌশল ক'রে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিলো। সেই রাত্রে নৌকাটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো ক'রে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হ'লো।

মীরজান সমস্তই বুঝ্‌লে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌লে, "হুজুর গোস্তাকি হ'য়েছিলো, এখন—"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "এখন সেটা এমন স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লে কি ক'রে?",

তার জবাব না দিয়ে সে ব'ল্‌লে, "সে নৌকোখানার দাম দু'হাজার টাকার কম হবে না, হুজুর! এখন আমার হুঁস হ'য়েচে,—এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—"

ব'লে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধ'র্লো। তাকে ব'ল্লুম্, আর দিন দশেক পরে আমার কাছে আস্তে। এই লোকটাকে যদি এখন দু'হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হ'লে এ'কে কিনে রাখ্তে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আন্তে পার্লে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি ক'রে টাকা যোগাড় ক'র্তে না পার্লে কোনো ফল হবে না।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আস্বামাত্র চৌকী থেকে উঠে তাকে ব'ল্লুম্, "রাণী, সব হ'য়ে এসেচে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।"

বিমলা ব'ল্লে, "টাকা? কতো টাকা?"

আমি ব'ল্লুম্, "খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক্ টাকা চাই!"

বিমলা জিজ্ঞাসা ক'র্লে, "কতো চাই বলুন!"

আমি ব'ল্লুম্, "আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।"

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চ'ম্কে উঠলে কিন্তু বাইরে সেটা গোপন ক'রে গেলো। বার বার সে কি ক'রে ব'ল্বে, যে, পার্বো না।

আমি ব'ল্লুম্, "রাণী, অসম্ভবকে সম্ভব ক'র্তে পারো তুমি! ক'রেওচো। কি যা ক'রেচো যদি দেখাতে পারতুম্ তো দেখ্তে। কিন্তু এখন তার সময় নয়; একদিন হয় তো সময় আস্বে। এখন টাকা চাই।"

বিমলা ব'ল্লে, "দেবো।"

আমি বুঝ্লুম্, বিমলা মনে মনে ঠিক ক'রে নিয়েচে ওর

গয়না বেচে দেবে। আমি ব'ল্‌লুম্‌, "তোমার গয়না এখন হাতে রাখ্‌তে হবে, কখন কি দরকার হয় বলা যায় না।"

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা নিতে হবে।"

বিমলা আরো স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। খানিক পরে সে ব'ল্‌লে, "তাঁর টাকা আমি কেমন ক'রে নেবো ?"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "তাঁর টাকা কি তোমার টাকা নয় ?"

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই ব'ল্‌লে, "নয় !"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "তা হ'লে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি ক'রে রেখেচে।"

বিমলা ব'ল্‌লে, "আমি সে টাকা পাবো কি ক'রে ?"

যেমন ক'রে হোক্‌। তুমি সে পার্‌বে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। 'বন্দেমাতরং' এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্ধুকের দরজা খুল্‌বে, ভাণ্ডার-ঘরের প্রাচীর খুল্‌বে, আর যারা ধর্ম্মের নাম ক'রে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে! মক্ষি, বলো—'বন্দেমাতরং !'

'বন্দেমাতরং।'

সন্দীপের আত্মকথা

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেবো। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ ক'র্‌চি; অমরা যতোই তার কাছে দাবী ক'রেচি ততোই সে আমাদের বশ মেনেচে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েচি, গাছ কেটেচি, মাটি খুঁড়েচি, পশু মেরেচি, পাখী মেরেচি, মাছ মেরেচি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় ক'রে এসেচি—আমরা সেই পুরুষ জাত। বিধাতার ভাণ্ডারের কোনো লোহার সিন্ধুককে আমরা রেয়াত করিনি—আমরা ভেঙেচি আর কেড়েচি।

এই পুরুষদের দাবী মেটানোই হ'চ্চে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবী মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্ব্বরা হ'য়েচে, সুন্দরী হ'য়েচে, সার্থক হ'য়েচে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা প'ড়ে সে আপনাকে আপনি জান্‌তো না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাক্‌তো; তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেতো, আর শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেতো না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবীর জোরে মেয়েদের আজ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েচি। কেবলি আমাদের কাছে

আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো ক'রে বেশি ক'রে পেয়েচে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা ক'রে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এম্‌নি ক'রে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হ'চ্চে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হ'চ্ছে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেচি। মনের ধর্ম্মই না কি আপনার সঙ্গে না-হক্‌ ঝগ্‌ড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খট্‌কা লেগেছিলো। মনে হ'য়েছিলো, এটা বড়ো বেশি কঠিন হ'লো। একবার ভাব্‌লুম্‌ ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেবো? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুস্‌, পুরুষ জাত এই জন্যেই তো সকর্ম্মক, আমরা অকর্ম্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক ক'রে তুল্‌বো যে। আমরা আজ পর্য্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আস্‌তুম্‌ তা হ'লে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাক্‌তো। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য ক'র্‌বার জন্যেই! নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন?

বিমলার অন্তরাত্মা চাইচে যে আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবী ক'র্‌বো, তাকে ম'র্‌তে ডাক দেবো। এ না হ'লে সে খুসি হবে কেন? এতোদিন সে ভালো ক'রে কাঁদ্‌তে পায় নি ব'লেই তো আমার পথ চেয়ে ব'সেছিলো।

এতোদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিলো ব'লেই তো আমাকে দেখ্‌বামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হ'য়ে ঘনিয়ে এলো। আমি যদি দয়া ক'রে তার কান্না থামাতেই চাই তা'হলে জগতে আমার দরকার ছিলো কি!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খট্‌কা বেধেছিলো তার প্রধান কারণ এটা যে টাকার দাবী। টাকা জিনিষটা যে পুরুষ মানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো ক'র্‌তে হ'লো! এক আধ হাজার হ'লে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হ'লো ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিলো। এতোদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেচে: এটা, আর যাকে হোক্, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হ'তো তাকে মাপ ক'র্‌তুম্ কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ সুতরাং অমার্জ্জনীয়। বাসা ভাড়া ক'র্‌লে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌বো, আর রেলে চাপ্‌বার সময় অনেক চিন্তা ক'রে টাকার থলি টিপে টিপে ইণ্টারমিডিয়েটের টিকিট কিন্‌বো এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখ্‌তে পাই নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরীব হ'লে ওকে কিছুই বেমানান্ হ'তো না। তাহ'লে

ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাক্‌রা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাষ্টারের জুড়ি হ'তে পার্‌তো।

আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দু'দিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরীবের ছদ্মবেশটা দু'দিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা সখ্‌ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে সেই দু'চার হাজারেই ঠেক্‌বে। তাই সই "অৰ্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" ব'লেচে, কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো আনা, এমন কি, পনেরো আনাও ত্যজতি।

এই পর্য্যন্ত লিখেচি,—এ গেলো আমার খাযের কথা। এ সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েচে, এখনি একবার তার কাছে যাওয়া চাই; শুন্‌চি একটা গোলমাল বেধেচে।

* * * *

নায়েব ব'ল্‌লে, যে লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হ'য়েছিলো, পুলিস তাকে সন্দেহ ক'রেচে; লোকটা পুরোনো দাগী—তাকে নিয়ে টানাটানি চ'ল্‌চে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি! বিশেষত নিখিল রেগে র'য়েচে, নায়েব স্পষ্ট

তো কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না। নায়েব আমাকে ব'ল্‌লে—"দেখুন, আমাকে যদি বিপদে প'ড়্‌তে হয় আমি আপনাকে ছাড়্‌বো না।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায় ?"

নায়েব ব'ল্‌লে, "আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্য-বাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে।"

এখন বুঝ্‌চি, যে-চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় ক'রে রেখেছিলো সেটা এই কারণেই জরুরি—তার আর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এসব চাল নূতন শেখা যাচ্চে। যেমন ক'রে শত্রুর নৌকো ডুবেয়েচি প্রয়োজন হ'লেই তেম্‌নি ক'রে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিলো। শ্রদ্ধা আরও অনেকখানি বাড়্‌তো যদি চিঠিখানার জবাব লিখে-না-দিয়ে মুখে-দেওয়া যেতো।

এখন কথা হ'চ্চে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আর কিছু দূর গড়ায় তাহ'লে যে-লোকটার নৌকো ডুবনো গেচে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ ক'র্‌তে হবে। এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি, এই যে বেড়-জালটি পাতা হ'চ্চে এর মুনফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও প'ড়্‌বে। কিন্তু মনে মনে সেকথাটা চেপেই রাখ্‌তে হ'চ্চে। মুখে আমিও ব'ল্‌চি 'বন্দেমাতরং' আর সেও ব'ল্‌চে, 'বন্দেমাতরং'।

এসব ব্যাপার যে-আসবাব দিয়ে চালাতে হয় তার ফাটা

অনেক ;—যেটুকু পদার্থ টিঁকে থাকে তার চেয়ে গ'লে পড়ে ঢের বেশী। ধর্ম্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে ব'সে আছে, সেইজন্য নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হ'য়েছিলো, আর-একটু হ'লেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডাইরীতে লিখ্‌তে ব'সেছিলুম্। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার ক'র্‌তেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার ক'রে দিয়েচেন—নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাক্‌বার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনই ভোলাইনে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগ্‌তে পার্‌লুম্ না। যেটা সত্য সেটা ভালও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হ'লো বিজ্ঞান। মাটি যতোটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। 'বন্দেমাতরমে'র নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষ্‌বে—সে জল আমিও শুষ্‌বো, ঐ নায়েবও শুষ্‌বে—তারপরেও যেটা থাক্‌বে সেইটেই হ'লো 'বন্দেমাতরং'। এ'কে কপটতা ব'লে গাল দিতে পারি কিন্তু এটা সত্য—এ'কে মান্‌তে হবে! পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড়ো কাজ ক'র্‌বার সময় এই পাঁকের দাবীর হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজনটা বড়ো

প্রয়োজনের অন্তর্গত—কারণ ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক্ টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না। এখনি যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ্ ক'রে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পর্শুদিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন ক'র্‌তেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ ক'র্‌লুম্, নিখিলের মাষ্টার মশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ ক'র্‌তে হয় না।

ছ'টা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম-দু'টো এবং শেষ-দু'টো হ'চ্চে পুরুষের, আর মাঝখানের দু'টো হ'চ্চে কাপুরুষের। কামনা ক'র্‌বো, কিন্তু লোভ থাক্‌বে না, মোহ থাক্‌বে না। তা থাক্‌লেই কামনা হ'লো মাটি। মোহ জিনিষটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্ত্ত-মানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হ'চ্ছে তারা। এখনি যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারেনি, যারা অন্য-কালের বাঁশি শুন্‌চে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুন্‌তে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হ'য়ে কামনা ক'রে তাকে

হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদের জন্যে মোহ-মুদ্গর—
'কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।'

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধ'রেছিলুম্, তারি রেস্ ওর মনের মধ্যে বাজ্‌চে। আমার মনেও তার ঝঙ্কারটা থামে নি। এই রেস্-টুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বারবার অভ্যস্ত ক'রে মোটা ক'রে তুলি তা'হলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চ'ল্‌চে তখন সেটা তর্কে এসে নাব্‌বে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা "কেন" জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিষটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ ক'রে কি হবে? এখন আমার কাজের ভিড়—অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্য্যন্তই থাক্, তলানি পর্য্যন্ত গেলে গোলমাল বাধ্‌বে। যখন তার ঠিক সময় আস্‌বে তখন তাকে অবজ্ঞা ক'র্‌বো না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ কর, এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণা-যন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে তা'র মিহি তারে মীড় লাগাতে থাকো।

এদিকে কাজের আসর আমাদের জ'মে উঠেচে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর ব'লে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেচি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আন্‌তে পার্‌বো না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে।

আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের ক'রে হাঁউ ক'রে উঠে, একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাবো।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিষ হয় তাহ'লে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, "তা হ'তে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর ক'রে ওদের বসিয়ে দিতে হবে—নইলে ওরা বিরোধ ক'র্‌বেই।"

নিখিল বলে, "বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?"

আমি বলি, "তোমার প্ল্যান্ কি?"

নিখিল বলে, "বিরোধ মেটাবার একটি মাত্র পথ আছে।"

আমি জানি, সাধুলোকের-লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেক্‌বেই। আশ্চর্য্য এই, এতোদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্‌চে কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাধে আমি বলি, নিখিল হ'চ্চে একেবারে জন্ম-স্কুল-বয়্! গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েচে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও ম'রেও মান্‌তে চায় না। মুস্কিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক ক'রে রেখেচে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেকদিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তাহ'লে দেখ্‌তে দেখ্‌তে

সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখ্‌তে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগ্‌বে না। দেশের একটা দেবী-প্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিলো, তারা ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, একটা মূর্ত্তি বানানো যাক্।" আমি ব'ল্‌লুম্, "আমরা বানালে চ'ল্‌বে না, যে-প্রতিমা চলে' আস্‌চে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা ক'রে তুল্‌তে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর ক'রে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আন্‌তে হবে।"

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বে আমার খুব তর্ক হ'য়ে গেছে। নিখিল ব'ল্‌লে, "যে কাজকে সত্য ব'লে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন ক'র্‌বার জন্যে মোহকে দলে টানা চ'ল্‌বে না।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না; আর পৃথিবীর বারো-আনা-ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হ'য়েছে—মানুষ আপনাকে চেনে।"

নিখিল ব'ল্‌লে, "মোহকে ভাঙ্‌বার জন্যেই দেবতা। রাখ্‌বার জন্যে অপদেবতা।"

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্চি অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রচিনে; এই দেখো না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব ব'লচি,

তার পায়ের ধূলো নিচ্চি, দান-দক্ষিণেরও অন্ত নেই, অথচ এতো বড়ো একটা তৈরি জিনিষকে বৃথা নষ্ট হ'তে দিচ্চি, কাজে লাগাচ্চিনে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পূরো ওদের হাতে দেওয়া যায়, তাহ'লে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পারি। কেননা, পৃথিবীতে একদল জীব আছে তারা পদতলচর; তাদের সংখ্যাই বেশি; তারা কোনো কাজই ক'র্‌তে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধূলো পায়, তা পিঠেই হোক্ আর মাথাতেই হোক্। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেল-গুলোকে এতোদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেচি, আজ সেটা হানবার দিন এসেচে, আজ কি তাদের সরিয়ে ফেল্‌তে পারি?

কিন্তু নিখিলকে এ সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিষটা ওর মনে একটা নিছক্ প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য ব'লে কোনো একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতোবার ব'লেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝ্‌তো ব'লেই অসঙ্কোচে ব'ল্‌তে পেরেচে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হ'লেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য ব'লে মান্‌তে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ ক'র্‌বে। আমাদের যে-রকমের স্বভাব কিম্বা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মান্‌তে পারিনে কিন্তু দেশের

প্রতিমাকে অনায়াসে মান্‌তে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার ক'র্‌তে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ ক'র্‌বে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লে, "সত্যের সাধনা ক'র্‌বার শক্তি তোমরা খুইয়েচো ব'লেই, তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধ'রে দেশের যখন সকল কাজই বাকী তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে ব'সে র'য়েচো।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "অসাধ্য সাধন করা চাই, সেই জন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।"

নিখিল ব'ল্‌লে, "অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠ্‌চে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এম্‌নিই থাক্‌বে কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি!"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "নিখিল, তুমি যা ব'ল্‌চো ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাক্‌তে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চ'ল্‌বে না। স্পষ্টই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করিনি সেই ফসল হুহু ক'রে ফলে উঠ্‌চে—কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা ব'লে মনের মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্চি ব'লে। এইটেকেই মূর্ত্তি দিয়ে চিরন্তন ক'রে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে! আজ দেশ যা ভাব্‌চে, আমি তাকে রূপ দেবো। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে ব'লে

বেড়াবো, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েচেন, তিনি পূজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে ব'ল্‌বো, দেবীর পূজারি তোমরাই—সেই পূজো বন্ধ আছে ব'লেই তোমরা নাব্‌তে ব'সেচো। তুমি ব'ল্‌বে, আমি মিথ্যা ব'ল্‌চি! না এ সত্য,—আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোন্‌বার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা ক'রে র'য়েচে, সেই জন্যেই ব'ল্‌চি একথা সত্য! যদি আমার বাণী আমি প্রচার ক'র্‌তে পারি তাহ'লে তুমি দেখ্‌তে পাবে এর আশ্চর্য্য ফল!"

নিখিল ব'ল্‌লে, "আমার আয়ু কতো দিনইবা! তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে, তারো পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।"

নিখিল ব'ল্‌লে, "আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।"

আসল কথা, বাঙালীর যে-একটা বড়ো ঐশ্বর্য্য আছে, কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়তো নিখিলের ছিলো কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্ম্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হ'য়ে উঠে' ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফে'ল্‌লে ব'লে! ভারতবর্ষে এই যে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী পূজা বাঙালী উদ্ভাবন ক'রেচে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়েচে। আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালী যে দেশ-শক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা

ক'রেছিলো, এ দুই দেবী তাঁরই দুই রকমের মূর্ত্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গ'ড়্‌তে পেরেচে?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হ'য়ে গেছে ব'লেই সে আমাকে অনায়াসে ব'ল্‌তে পার্‌লে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিলো, বাঙালী তার দেবীমূর্ত্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র প'ড়ে ফল কামনা ক'রেছিলো, কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই, ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হ'লো। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ ক'র্‌তে থাক্‌বো, সেই দিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুস্কিল হ'চ্চে, কাগজে কলমে লিখ্‌লে নিখিলের কথা শোনায় ভালো—কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখ্‌বার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখ্‌বার। পণ্ডিত যে রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে, সে রকম নয়, লাঙ্গলের ফলা দিয়ে চাষী যে রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেই রকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হ'লো, আমি ব'ল্‌লুম্, "যে-দেবতার সাধনা ক'র্‌বার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেচি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন, ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে কি বিশ্বাস ক'র্‌তে পেরেচি? তোমাকে যদি না দেখ্‌তুম্ তাহ'লে আমার সমস্ত

দেশকে আমি এক ক'রে দেখ্‌তে পেতুম্ না, একথা আমি তোমাকে কতোবার ব'লেছি, জানিনে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারো কি না। একথা বোঝানো ভারি শক্ত যে. দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্ত্ত্য লোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা এক রকম ক'রে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝ্‌তে পেরেচি।"—এই প্রথম বিমলা আমাকে "আপনি" না ব'লে "তুমি" ব'ল্‌লে।

আমি ব'ল্‌লুম্, "অর্জ্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথি-রূপে সর্ব্বদা দেখ্‌তেন তাঁরও একটি বিরাটরূপ ছিলো, সেও একদিন অর্জ্জুন দেখেছিলেন;—তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার; তোমারি কালো চোখের কাজলমাখা পল্লব আমি দেখ্‌তে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে; আর কচি ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরে শাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায়; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেচি জ্যৈষ্ঠের যে-রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব্ বের ক'রে দিয়ে হা হা ক'রে শ্ব'স্‌তে থাকে! দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য্য রকম ক'রে দেখা দিয়েচেন তখন তাঁরি পূজো আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার ক'র্‌বো, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। "তোমারই মূরতি গড়ি মন্দিরে

মন্দিরে!” কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট ক’রে বোঝেনি। তাই আমার সঙ্কল্প সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্ত্তিটি নিজের হাতে গ’ড়ে এমন ক’রে তার পূজো দেবো যে, কেউ তাকে আর অবিশ্বাস ক’র্‌তে পার্‌বে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও!”

বিমলার চোখ বুজে এলো। সে যে-আসনে ব’সেছিলো সেই আসনের সঙ্গে এক হ’য়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্ত্তির মতোই স্তব্ধ হ’য়ে রইলো। আমি আর খানিকটা ব’ল্‌লেই সে অজ্ঞান হ’য়ে প’ড়ে যেতো। খানিক পরে সে চোখ মেলে ব’লে উঠ্‌লো, —“ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েচো, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই। আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সাম্‌লাতে পার্‌বে না। রাজা আস্‌বে, তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আস্‌বে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় ক’রে দেবার জন্যে, যাদের আর কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র ম’র্‌বার জন্যে তোমার কাছে এসে সেধে প’ড়্‌বে। ভালো-মন্দর বিধি-বিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে! রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কি দেখ্‌চো তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার এই হৃদয়পদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখ্‌লুম্। তারকাছে আমি কোথায় আছি! সর্ব্বনাশ গো সর্ব্বনাশ, কি তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেল্‌বে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচিনে, আমি তো আর পারিনে, আমার যে বুক ফেটে গেলো।”

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর প'ড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধ'র্‌লে। তার পরে ফুলে ফুলে' কান্না কান্না কান্না!

এই তো হিপ্‌নটিজ্‌ম! এই শক্তিই পৃথিবী জয় ক'র্‌বার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন! কে বলে সত্যমেব জয়তে! জয় হবে মোহের।—বাঙালী সে কথা বুঝেছিলো, তাই বাঙালী এনেছিলো দশভুজার পূজা, বাঙালী গ'ড়েছিলো সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি। সেই বাঙালী আবার আজ মূর্ত্তি গ'ড়্‌বে, জয় ক'র্‌বে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে—বন্দেমাতরং!

আস্তে আস্তে হাতে ধ'রে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে' বসালুম্‌। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আস্‌বার আগেই তাকে ব'ল্‌লুম্‌, "বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা ক'র্‌বার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েচেন, কিন্তু আমি যে গরীব।"

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোক তখনো বাষ্পে ঢাকা; সে গদ্গদ কণ্ঠে ব'ল্‌লে, "তুমি গরীব কিসের? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারি। কিসের জন্যে বাক্স ভ'রে আমার গয়না জমে র'য়েচে? আমার সমস্ত সোনা-মাণিক তোমার পূজোয় নাও না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।"

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিলো—আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধ্‌লো। সঙ্কোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেচি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না

দিয়ে সাজিয়ে এসেচে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্চিনে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢাল্‌বো। এমন সমারোহ ক'রে ক'র্‌তে হবে যে তেমন পূজা এদেশে কেউ কোনো দিন দেখেনি! চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্ম্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাবো। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি ক'র্‌বে সন্দীপ।

এ তো গেলো বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়্‌তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হ'লে তো চ'ল্‌বেই না, পাঁচ হাজার হ'লেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতোবড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে? কিন্তু আর সময় নেই।

সঙ্কোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ব'লে ফে'ল্‌লুম্‌,—"রাণী, এদিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হ'য়ে এলো, কাজ বন্ধ হয় ব'লে!"

অম্‌নি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিলে। আমি বুঝ্‌লুম্‌, বিমলা ভাব্‌চে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবী ক'র্‌চি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে র'য়েচে—বোধ হয় সারারাত ভেবেচে, কিন্তু কোনো কিনারা পায়নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট ক'রে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পার্‌চে না, সেই জন্যে ওর মন চাচ্চে এই মস্ত একটা টাকাকে

ওর অবরুদ্ধ আদরের প্রতিরূপ ক'রে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগ্‌চে। ওযে এখন সম্পূর্ণ আমারি; উপ্‌ড়ে তোল্‌বার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে।

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "রাণী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব ক'রে দেখ্‌চি পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার হ'লেও চ'লে যাবে।"

হঠাৎ টানটা ক'মে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে যেন একটা গানের মতো ব'ল্‌লে, "পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেবো!"

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিলো—

বঁধুর লাগি কেশে আমি প'র্‌বো এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তিন ভুবনে নাইক যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজ্‌বে না সে,
দেখ্‌লো চেয়ে যমুনা ঐ ছাপিয়ে গেলো কূল!

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা—"পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেবো।" "বঁধুর লাগি কেশে আমি পর্‌বো এমন ফুল!" বাঁশির ভিতরকার ফাঁক্‌টি সরু ব'লেই, চারিদিকে তার বাধা ব'লেই, এমন সুর—অতি-লোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপ্‌টা ক'রে দিতুম্‌, তাহ'লে শোনা যেতো,—কেন, এতো টাকায় তোমার দরকার

কি? আর আমি মেয়েমানুষ অতো টাকা পাবোই বা কোথা? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিল্‌তো না। তাই ব'ল্‌চি, মোহটাই হ'লো সত্য,—সেইটাই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হ'চ্চে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক—সেই অত্যন্ত নির্ম্মল শূন্যতাটা যে কি, তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েচে, ওর মুখ দেখ্‌লেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই আমি মোহটাকে পারৎপক্ষে হাত থেকে ফস্‌কাতে দেবো না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী— অতএব এ নিয়ে দুঃখ ক'রে কি হবে?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখ্‌বার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দ্দিনীর পূজোর মন্ত্রণায় ব'সে গেলুম্। পূজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকায় রুই-মারীতে অঘ্রাণের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পূজোটা যদি দেওয়া যায় তাহ'লে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ও মনে ক'র্‌লে এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এতো বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাস্‌লুম্;—যারা ন'বছর দিন-রাত্তির এক-সঙ্গে কাটিয়েচে, তারাও পরস্পরকে কতো অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের

বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন'বছর ধ'রে ব'সে ব'সে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস ক'রে এসেচে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই, আজ ওরা বুঝ্‌তে পার্‌চে কোনোদিন যে-ছুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কি ক'রে?

যাক্, যারা ভুল বুঝেছিলো তারা ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে ঠিক্ ক'রে বুঝে নিক্ তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা ক'র্‌বার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যতো শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হ'চ্চে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্য্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকম ভাবে ব'ল্‌লুম্ "রাণী, তাহ'লে টাকাটা কবে—"

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়—"

আমি ব'ল্‌লুম্, "না, দেরী হ'লে চ'ল্‌বে না।"

"তোমার কবে চাই?"

"কালই।"

"আচ্ছা কালই এনে দেবো।"

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে সুরু হ'য়েচে—শুন্‌চি একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে তারও উদ্যোগ হ'চ্চে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেই সঙ্গে অজস্র মিথ্যে কথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচ্‌কারিটা তাদেরই হাতে—আমি ভদ্রলোক রাস্তার একপাশ দিয়ে চ'লেচি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখ্‌বার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হ'য়ে র'য়েচে কেবল আমার ভয়েই কিছু ক'র্‌তে পার্‌চে না,—দুই একজন সাহসী যারা দিশি জিনিষ চালাতে চায়, জমিদারী চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন ক'র্‌চি। পুলিসের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি চালাচালি ক'র্‌চি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েচে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জ্জিত খেতাব যোগ ক'রে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেচে, "স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফরমাস দিয়েছে, সে খবরও আমরা রাখি!"—আমার নামটা স্পষ্ট ক'রে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো ক'রে ফুটে উঠেচে।

এদিকে মাতৃবৎসল হরিশকুণ্ডুর গুণগান ক'রে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্চে। লিখেচে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাক্‌তো তাহ'লে এতোদিনে ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানাঘরের চিম্‌নিগুলো পর্য্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁক্‌তে থাক্‌তো।

এদিকে আমার নামে লাল কালীতে লেখা একখানা চিঠি এসেচে, তাতে খবর দিয়েচে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হ'য়েচে। ব'লেচে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগ্‌বেন; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাক্‌তে না পারে তার ব্যবস্থা হ'চ্চে।

নাম সই ক'রেচে, "মায়ের কোলের অধমসরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।"

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম্। বি, এ, গম্ভীর ভাবে ব'ল্‌লে, "আমরাও শুনেচি, দেশে একদল লোক মরিয়া হ'য়ে র'য়েচে, স্বদেশীর বাধা দূর ক'র্‌তে তারা না ক'র্‌তে পারে এমন কাজ নেই।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "তাদের অন্যায় জবরদস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তাহ'লে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।"

ইতিহাসে এম্, এ, ব'ল্‌লেন, "বুঝ্‌তে পারচি নে।"

আমি ব'ল্লুম্, "আমাদের দেশ, দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্য্যন্ত ভয় ক'রে ক'রে আধমরা হ'য়ে র'য়েচে, আজ তোমরা মুক্তির নাম ক'রে সেই জুজুর ভয়কে ফের আরএক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপণ ক'র্তে চাও তাহ'লে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নীচু ক'র্বে না।"

ইতিহাসে এম. এ, ব'ল্লেন, "এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয় ?"

আমি ব'ল্লুম্, "এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্য্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতোটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তাহ'লে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন ক'র্বার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কি কাপড় প'র্বে, কোন্ দোকান থেকে কিন্‌বে, কি খাবে, কার সঙ্গে ব'সে খাবে এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তাহ'লে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁসে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হ'লো মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।"

ইতিহাসে এম, এ, ব'ল্লেন, "অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া-ঘেঁসে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই ?"

আমি ব'ল্লুম্, "কে ব'ল্লে নেই ? মানুষকে নিয়ে দাস-

ব্যবসা যেদেশে যে-পরিমাণে আছে সে-পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট ক'রেচে।"

এম এ, ব'ল্‌লেন, "তাহ'লে ঐ দাসব্যবসাটা মানুষেরই ধর্ম্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।"

বি, এ, ব'ল্‌লেন, "সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে! এই যে ওপারে হরিশকুণ্ডু আছেন জমিদার, কিম্বা সান্‌কিভাঙার চক্রবর্ত্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ একছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন? কেন না বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চ'লেচেন;—যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হ'চ্চে তাদের সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ।

এফ, এ, প্লাক্‌ড্ ছোক্‌রাটি ব'ল্‌লে, "একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্ত্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিলো। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্ত্তীদের কিছুতে মান্‌ছিলো না। মাম্‌লা ক'র্‌তে ক'র্‌তে শেষকালে তার এমন দশা হ'লো যে খেতে পায় না। যখন দু'দিন তার ঘরে হাঁড়ি চ'ড়্‌লো না তখন স্ত্রীর রূপোর গয়না বেচ্‌তে বেরলো; এই তার শেষ সম্বল; জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিন্‌তেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব ব'ল্‌লে, "আমি কিন্‌বো পাঁচ টাকা দামে।" দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হ'লো তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব ব'ল্‌লে, "এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা বাকিতে জমা ক'রে নিলুম্।"—এই কথা শুনে আমরা

সন্দীপবাবুকে ব'লেছিলুম্ চক্রবর্ত্তীকে আমরা বয়কট্ ক'র্‌বো। সন্দীপবাবু ব'ল্‌লেন, "এই সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তাহ'লে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ ক'র্‌বে? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে ক'র্‌তে জানে, এরাই প্রভু। যারা যোল আনা ইচ্ছে ক'র্‌তে জানে না, তারা, হয় এদের ইচ্ছেয় চ'ল্‌বে, নয় এদের ইচ্ছেয় ম'র্‌বে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা ক'রে ব'ল্‌লেন, আজ চক্রবর্ত্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে স্বদেশী নিয়ে টুঁশব্দটি ক'র্‌তে পারে—অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে ক'র্‌লেও স্বদেশী চালাতে পার্‌বেন না।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিষ চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাইনে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরী হবে।"

ঐতিহাসিক হেসে ব'ল্‌লে, "আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না। কেননা সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি—পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। একথা শিখ্‌তে আমাদের সময় লেগেছে, কেন না, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেচি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় ক'র্‌তে বেরিয়েছিলো—একটা মুসলমান প্রজার বেচে কিনে নেবার মতো কিছু ছিলো না। ছিলো তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি ব'ল্‌লে; তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ ক'রতে হবে। নিকে ক'রবার

উমেদার জুটে গেলো, টাকাও শোধ হ'লো। আপনাকে ব'ল্‌চি, স্বামীটার চোখের জল দেখে' আমার রাত্রে ঘুম হয়নি, কিন্তু যতোই কষ্ট হোক্ আমি এটা শিখেচি যে যখন টাকা আদায় ক'র্‌তেই হবে তখন. যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ ক'র্‌তে পারে, মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়ো ;—আমি পারিনে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই সব গোমস্তা, এই সব কুণ্ডু. এই সব চক্রবর্ত্তীরা !"

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম্, ব'ল্‌লুম, "তাই যদি হয়, তবে এই সব গোমস্তা, এই সব কুণ্ডু. এই সব চক্রবর্ত্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনই সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বৌ হ'য়ে যে মার খায় শাশুড়ি হ'য়ে সে সব চেয়ে বড়ো মার মারে। সমাজে যে-মানুষ মাথা হেঁট ক'রে থাকে সে যখন বরযাত্র হ'য়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্ব্বিচারে কেবলি সকল-তা'তেই সকলকে মেনে এসেচো, সেইটেকেই ধর্ম্ম ব'ল্‌তে শিখেচো, সেই জন্যেই আজকে অত্যাচার ক'রে সকলকে মানামোটাকেই তোমরা ধর্ম্ম ব'লে মনে ক'র্‌চো। আমার লড়াই দুর্ব্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে !"

আমার এসব কথা অত্যন্ত সহজ কথা—সরল লোককে ব'ল্‌লে বুঝ্‌তে তো মুহূর্ত্তমাত্র দেরী হয় না, কিন্তু আমাদের

যে-সব এম্-এ, ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ ক'ষ্চে সত্যকে পরাস্ত ক'র্বার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এদিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাব্চি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা পরিমিত, এমন কি, সাক্ষী না থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘটনা ঘটেনি জোগাড় ক'র্তে পার্লে তার সাক্ষীর অভাব হয় না। আমি যে মৌরসী স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেচি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাব্ছিলুম্ পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘরবাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাষ্টার মশায় ব'ল্লেন, "অন্যায়ের কাছে সহজে হার মান্তে পার্বো না। আমি নিজে চেষ্টা দেখ্বো।"

"আপনি চেষ্টা দেখ্বেন?"

"হাঁ আমি।"

এ সমস্ত মামলা মকদ্দমার ব্যাপার—মাষ্টার মশায় যে কি ক'র্তে পারেন বুঝ্তে পার্লুম্ না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হ'লো না। খবর নিয়ে জান্লুম্, তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, চাকরদের কেবল এইটুকু ব'লে গেছেন, তাঁর ফির্তে দু'চার দিন দেরী হবে। আমি ভাব্লুম্, সাক্ষী সংগ্রহ ক'র্বার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চ'লে গেচেন। তা যদি হয় আমি জানি সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী পূজো, মহরম এবং রবিবারে

জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিলো তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেলো না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হ'য়ে আস্‌তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রঙ বদল হ'য়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠা বাড়িতে বাস করে। তারা "বাহির" ব'লে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে চ'ল্‌তে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইসারা একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়ে, আলো অন্ধকারের সমস্ত মীড় বুকের ভিতর বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তা'র অসংখ্য কাজ নিয়ে চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হ'য়ে আসে, যখন স্বর্গের জানালা থেকে মর্ত্ত্যের উপর পর্দ্দা নেমে আস্‌তে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল ক'র্‌বার জন্যেই,—এখন কেবল একের সঙ্গে অনন্ত অন্ধকারকে ভ'রে তুল্‌বে, এইটেই ছিলো জলস্থল-আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌বে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আস্‌বে, আলো অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিলো এই। আমি সেটাকে অস্বীকার ক'রে কঠিন হ'য়ে থাক্‌তে পারিনে,—তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো

অনিমেষ হ'য়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন ব'ল্‌তে থাকে, —সত্য নয়, একথা কখনই সত্য নয়, যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত ;—মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক্ না সে সত্যের মজুরি, ধর্ম্মের মজুরি,—সেই তারার আলোয় ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ সেই অন্ধকারের অমৃতে ডুবে ম'র্‌বার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মতো হারালি, নিখিলেশ ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না, সেইখানে যে-লোক এক্‌লা হ'য়েচে সে কি ভয়ানক এক্‌লা !

সেদিন বিকালবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌঁচেছে, তখন আমার কাজ ছিলো না, কাজে মনও ছিলো না, মাষ্টার মশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁক্‌ড়ে ধ'র্‌তে চাচ্ছিলো তখন আমি বাড়ীর ভিতরের বাগানে গেলুম্‌। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড়ো সখ। আমি টবে ক'রে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম্‌, যখন সমস্ত গাছ ভ'রে ফুল ফুটে' উঠ্‌তো তখন মনে হ'তো সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেচে। কিছুকাল আমি বাগানে যাইনি, আজ মনে মনে একটু হেসে ব'ল্‌লুম্‌, "আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসিগে।"

বাগানে যখন ঢুক্‌লুম্‌ তখন কৃষ্ণ প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক্‌ আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েচে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া—তারই উপর দিয়ে বাঁকা

হ’য়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে প’ড়েচে। ঠিক আমার মনে হ’লো চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধ’রে মুচ্‌কে হাস্‌চে।

পাঁচিলের যে-ধারটিতে গ্যালারির মতো ক’রে থাকে-থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো র’য়েচে সেই দিকে গিয়ে দেখি সেই পুষ্পিত সোপান শ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ্‌ ক’রে শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ ক’রে উঠ্‌লো। আমি কাছে যেতেই সেও চ’ম্‌কে তাড়াতাড়ি উঠে ব’স্‌লো।

তারপর কি করা যায়? আমি ভাব্‌চি আমি এইখান থেকে ফিরে যাবো কি না, বিমলাও নিশ্চয় ভাব্‌ছিলো সে উঠে চ’লে যাবে কি না। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চ’লে যাওয়াও তেম্‌নি। আমি কিছু-একটা মন স্থির করার পূর্ব্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চ’ল্‌লো।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্ব্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্ত্তিমান হ’য়ে দেখা দিলো। সেই মুহূর্ত্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেলো! আমি তা’কে ডাক্‌লুম্‌, বিমলা!

সে চ’ম্‌কে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফির্‌লো না। আমি তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম্‌। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো প’ড়্‌লো। সে দুই হাত মুঠো ক’রে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি

ব'ল্‌লুম্, "বিমলা, আমার এই পিঁজ্‌রের মধ্যে চারিদিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধ'রে রাখ্‌বো ? এমন ক'রে তো তুমি বাঁচ্‌বে না !"

বিমলা চোখ বুজেই রইলো, একটি কথাও ব'ল্‌লে না।

আমি ব'ল্‌লুম্, "তোমাকে যদি এমন জোর ক'রে বেঁধে রাখি তাহ'লে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হ'য়ে উঠ্‌বে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে ?"

বিমলা চুপ ক'রেই রইলো।

আমি ব'ল্‌লুম্, "এই আমি তোমাকে সত্য ব'ল্‌চি—আমি তোমাকে ছুটি দিলুম্। আমি যদি তোমার আর কিছু না হ'তে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাতকড়া হবো না !"

এই ব'লে আমি বাড়ির দিকে চ'লে গেলুম্। না, না, এ আমার ঔদার্য্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়্‌তে না পার্‌লে কিছুতেই ছাড়া পাবো না। যাকে আমার হৃদয়ের হার ক'র্‌বো তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা ক'রে রেখে দিতে পার্‌বো না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই ক'র্‌চি আমি সুখ না পাই, নাই পেলুম্; দুঃখ পাই সেও স্বীকার কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য ব'লে ধ'রে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও !

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাষ্টার মশায় ব'সে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলচে

মাষ্টার মশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার আগে ব'লে উঠ্‌লুম্—"মাষ্টার মশায়, মুক্তিই হ'চ্চে মানুষের সব চেয়ে বড়ো জিনিষ। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছুই-না!"

মাষ্টার মশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। কিছু না ব'লে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি ব'ল্‌লুম্, "বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে প'ড়েছিলুম্, ইচ্ছাটাই বন্ধন, সে নিজেকে বাঁধে অন্যকে বাঁধে। কিন্তু শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখীকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝ্‌তে পারি পাখীই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছাতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে ব'ল্‌চি পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝ্‌তে পার্‌চে না। সবাই মনে ক'র্‌চে, সংস্কার আর কোথাও ক'র্‌তে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া!"

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন, "আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে ক'রেচি সেটাকে হাতে ক'রে পাওয়াই স্বাধীনতা,—কিন্তু, আসলে, যেটা ইচ্ছে ক'রেচি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "মাষ্টার মশায়, অমন ক'রে কথায় ব'ল্‌তে গেলে টাক্-পড়া উপদেশের মতো শোনায়; কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাস মাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই

অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে' অমর। সুন্দরকে আমরা দেখ্‌তেই পাইনে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় ক'রেছিলেন, আলেক্‌জাণ্ডার করেন নি, একথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুক্‌নো গলায় বলি, এই কথা কবে গান গেয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে প'ড়্‌বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো?"

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল মাষ্টার মশায় ক'দিন ছিলেন না,—কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, "আপনি ছিলেন কোথায়?"

মাষ্টার মশায় ব'ল্‌লেন. "পঞ্চুর বাড়িতে।"

পঞ্চুর বাড়িতে? এই চারদিন সেখানেই ছিলেন?

হাঁ, মনে ভাব্‌লুম্ যে-মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেচে তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা ক'য়ে দেখ্‌বো। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো;—ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়েও যে এতো বড়ো অদ্ভুত কেউ হ'তে পারে এ কথা সে মনে ক'র্‌তেও পারে নি। দেখ্‌লে যে আমি র'য়েই গেলুম্। তার পরে তার লজ্জা হ'তে লাগ্‌লো। আমি তাকে ব'ল্‌লুম্, "মা, আমাকে তো তুমি অপমান ক'রে তাড়াতে পার্‌বে না। আর, আমি যদি থাকি তাহ'লে পঞ্চুকেও রাখ্‌বো; ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না।—দু'দিন আমার কথা চপ ক'রে শুনলো—হাঁও বলে না, নাও বলে না, শেষকালে

আজ দেখি পোঁট্‌লা-পোঁট্‌লি বাঁধ্‌চে। ব'ল্‌লে, "আমরা বৃন্দাবনে যাবো, আমাদের পথ-খরচ দাও।—বৃন্দাবনে যাবে না জানি কিন্তু একটু মোটা রকম পথ-খরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম্।"

আচ্ছা সে যা দরকার তা দেবো।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চ'ল্‌ছিলো। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ ক'রেচে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যা একটু-খানি ছিলো তাও এবার চুকে গেলো। আগে ওর ধারণা ছিলো অন্তত আমি লোকটা সরল, কিন্তু এবার ওর ধারণা হ'য়েচে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম্ সেটা কেবল তাকে বশ ক'র্‌বার ফন্দী। সংসারে ফন্দীটা চাই বটে কিন্তু তাই ব'লে একেবারে ধর্ম্মটা খোয়ানো? মিথ্যে সাক্ষিতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পার্‌তুম্, তাহ'লে বোঝা যেতো। —যাহোক বুড়ি বিদায় হ'লেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগ্‌লে থাক্‌তে হবে—নইলে হরিশকুণ্ডু কিছু একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ক'রে ব'স্‌বে। সে নাকি তার পারিষদদের কাছে ব'লেচে—"আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম্, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় ক'রেচে; দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কি ক'রে?"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "ও বাঁচ্‌তেও পারে ম'র্‌তেও পারে, কিন্তু এই যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি ক'র্‌চে, ধর্ম্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি হারও হয় তাহ'লেও আমরা সুখে ম'র্‌তে পার্‌বো।"

বিমলার আত্মকথা

একজন্মে যে এতোটা ঘ'ট্‌তে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাতজন্ম হ'য়ে গেলো। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হ'য়ে গেছে। সময় এতো জোরে চ'ল্‌ছিলো যে চ'ল্‌চে ব'লে বুঝ্‌তেই পারিনি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝ্‌তে পেরেচি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় ক'র্‌বার কথা যখন স্বামীর কাছে ব'ল্‌তে গেলুন্ তখন জান্‌তুন্ এই নিয়ে খানিকটা কথাকাটাকাটি চ'ল্‌বে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিলো যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চারদিকের বায়ুমণ্ডলে জাদু আছে। সন্দীপের মতো অতো বড়ো একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে প'ড়্‌লো। আমি তো ডাক দিইনি—সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখ্‌লুম্ সেই অমূল্যকে—আহা সে ছেলেমানুষ—কচি মুরলী বাঁশটির মতো সরল এবং সরস—সে আমার কাছে যখন এলো তখন ভোরবেলাকার নদীর মতো দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রঙ ফুটে উঠ্‌লো। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কি-রকম মুগ্ধ হ'তে পারেন সেদিন অমূল্যর

দিকে চেয়ে আমি তা বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতর কাজ করে, এমনি ক'রে তো তা দেখ্‌তে পেয়েচি।

তাই সেদিন নিজের পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম্‌। কিন্তু হ'লো কি? আজ ন'বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখিনি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্চে না। একটু যদি রাগও ক'র্‌তেন তাহ'লেও বাঁচ্‌তুম্‌। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পার্‌লুম্‌ না। মনে হ'লো আমি মিথ্যা। যেন স্বপ্ন,—স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেলো, অম্‌নি কেবল অন্ধকার রাত্রি!

এতোকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষ্যা ক'রে এসেচি। মনে জান্‌তুম্‌ বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি—আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভ'রে খেয়েচি, তার নেশা জ'মে উঠেচে। এখন হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর প'ড়ে গেলো। এখন বাঁচি কি ক'রে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধ্‌তে ব'সেছিলুম্‌! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজোরাণীর ঘরের সাম্‌নে দিয়ে যাবার সময় তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "কিলো ছোটোরাণী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মা'র্‌তে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?"

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে ব'ল্‌লেন, "তোমাকে ছুটি দিলুম্‌।" ছুটি কি এতোই সহজে দেওয়া যায় কিম্বা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিষ? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েচি —হঠাৎ আকাশে তুলে ধ'রে যখন ব'ল্‌লে, এই তোমার ছুটি —তখন দেখি এখানে আমি চ'ল্‌তেও পারিনে বাঁচ্‌তেও পারিনে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আস্‌বাব, শুধু আলনা—শুধু আয়না—শুধু খাট—এর উপরে সেই সর্ব্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। র'য়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝরণা একেবারে শুকিয়ে গেলো, পাথর আর নুড়ি-গুলো বেরিয়ে প'ড়েচে। আদর নেই, আস্‌বাব।

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতোটুকু টিকে আছে, সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এতো বড়ো একটা ধাঁধাঁ লাগ্‌লো তখন আবার দেখা হ'লো সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন তো আবার তেম্‌নি ক'রেই জ্বল্‌লো। কোথায় মিথ্যে! এ যে ভরপূর সত্য—দুই কূল ছাপিয়ে-পড়া সত্য। এই যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্চে, কথা ক'চ্চে, হাস্‌চে—ঐ যে বড়ো রাণী মালা জ'প্‌চেন, মেজো রাণী থাকো দাসীকে নিয়ে হাস্‌চেন, পাঁচালীর গান গাচ্চেন, আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই সমস্তর'চেয়ে হাজারগুণে সত্য!

সন্দীপ ব'ললেন "পঞ্চাশ হাজার চাই।"—আমার মাতাল

মন ব'লে উঠ্‌লো পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়! এনে দেবো! কোথায় পাবো, কি ক'রে পাবো, সেও কি একটা কথা! এই তো আমি নিজে এক মুহূর্ত্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি—এম্‌নি ক'রেই এক-ইসারায় সব-ঘটনা ঘ'ট্‌বে। পার্‌বো, পার্‌বো, পার্‌বো—একটুও সন্দেহ নেই।

চ'লে তো এলুম্‌। তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখি, টাকা কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন ক'রে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবোই। যেমন ক'রেই হোক্‌ তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেইখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ ক'রে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কা'রা—এই সব সন্ধান ক'র্‌চি। অর্দ্ধেক রাত্রে বাহির বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফ্‌তর-খানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েচি। ঐ লোহার গরাদের মুটো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেবো কি ক'রে? মনে দয়া ছিলো না—যারা পাহারা দিচ্চে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে ম'রে পড়ে তাহ'লে এখনি আমি উন্মত্ত হ'য়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রাণীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেবীর কাছে বর মাগ্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হ'য়ে রইলো, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হ'তে লাগ্‌লো, ঘণ্টায়

ঘণ্টায় ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা-বাজ্‌লো, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইলো।

শেষকালে একদিন অমুল্যকে ডাক্‌লুম্‌। ব'ল্‌লুম্‌, "দেশের জন্যে টাকার দরকার—খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের ক'রে আন্‌তে পার্‌বে না ?"

সে বুক ফুলিয়ে ব'ল্‌লে, "কেন পার্‌বো না ?"

হায়রে, আমিও সন্দীপের কাছে এম্‌নি ক'রে ব'লেছিলুম্‌, কেন পার্‌বো না ? অমূল্যের বুক-ফোলানো দেখে, একটুও আশ্বাস পেলুম্‌ না।

জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "কি ক'র্‌বে বলো দেখি ?"

অমুল্য এম্‌নি-সব আজগুবি প্ল্যান ব'ল্‌তে লাগ্‌লো যে, সে মাসিককাগজের ছোটো গল্পে ছাড়া কোথাও প্রকাশ ক'র্‌বারই যোগ্য নয়।

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "না, অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখো।"

সে ব'ল্‌লে. "আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ ক'র্‌বো।"

"টাকা পাবে কোথায় ?"

সে অম্লানমুখে ব'ল্‌লে, "বাজার লুঠ ক'রে।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে তাই দিয়ে হবে।"

অমূল্য ব'ল্‌লে, "কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চ'ল্‌বে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।"

"কি রকম ?"

"সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।"

"তবু শুনি।"

অমূল্য কোর্ত্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের ক'রে টেবিলের উপর রাখ্‌লে, তার পরে একটি ছোট পিস্তল বের ক'রে আমাকে দেখালে – আর কিছু ব'ল্‌লে না।

কি সর্ব্বনাশ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে ক'র্‌তে ওর এক মুহূর্ত্তও দেরী হ'লো না। ওর মুখখানি এমনতর যে, মনে হয় একটা কাক-মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতোখানি সত্য তা ও একেবারে দেখ্‌তে পাচ্চে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে,—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "বলো কি অমূল্য! আমাদের রায়-মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে—তার যে—"

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এদেশে পাবো কোথায়? দেখুন আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের পরেই দয়া,—পাছে নিজের দুর্ব্বল মনে ব্যথা লাগে সেই জন্যেই অন্যকে আঘাত ক'র্‌তে পারিনে—এই তো হ'লো কাপুরুষতার চূড়ান্ত!

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠ্‌লো। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো ব'লে বিশ্বাস

ক'র্‌বারই যে ওর সময়। আহা ওর যে বাঁচ্‌বার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠ্‌লো যে। নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিলো না মন্দও ছিলো না, ছিলো কেবল মরণ, মধুর রূপ ধরে'; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে ক'র্‌তে পার্‌লে একজন বুড়ো মানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম্ম তখন আমার গা শিউরে উঠ্‌লো। যখন দেখ্‌তে পেলুম্‌ ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ঙ্কর হ'য়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপ মায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখ্‌তে পেলুম্‌।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড়ো বড়ো ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন ক'র্‌তে লাগ্‌লো। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুক্‌তে চ'লেচে, এ'কে কে বাঁচাবে? আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধ'র্‌চে না? কেন এ'কে ব'ল্‌চে না, ওরে বাছা আমাকে তুই বাঁচিয়ে' কি ক'র্‌বি, তোকে যদি বাঁচাতে না পার্‌লুম্‌?

জানি, জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ সয়তানের সঙ্গে রফা ক'রে বেড়ে উঠেচে, কিন্তু মা যে আছে এক্‌লা দাঁড়িয়ে এই সয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ ক'র্‌বার জন্যে। মা তো কার্য্যসিদ্ধি চায় না, সে-সিদ্ধি যতো বড়ো সিদ্ধিই হোক্‌, মা যে বাঁচাতে চায়! আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্চে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধ'রে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি ক'র্‌তে ব'লেছিলুম্, এখন যতো-বড়ো উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের দুর্ব্বলতা ব'লে হাস্‌বে। মেয়েমানুষের দুর্ব্বলতাকে ওরা তখনি মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে ব'ল্‌লুম্, "যাও তোমাকে কিছু ক'র্‌তে হবে না —টাকা সংগ্রহ ক'র্‌বার ভার আমারই উপর।"

যখন সে দরজা পর্য্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম্ ব'ল্‌লুম্,—"অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাই-ফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।"

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থ'ম্‌কে রইলো। তার পরেই প্রণাম ক'রে আমার পায়ের ধূলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়ালো তার চোখ ছল্‌ছল্ ক'র্‌চে। ভাই আমার, আমি তো ম'র্‌তেই ব'সেচি— তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি—আমা হ'তে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে ব'ল্‌লুম্, "তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।"

"কি ক'র্‌বে দিদি?"

"মরণ প্র্যাক্‌টিস্ ক'র্‌বো।"

এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও ম'র্‌তে হবে, মার্‌তে হবে।—এই ব'লে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিলে।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তি-রেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম অরুণ-লেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেলো। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে ব'ল্‌লুম্, "এই রইলো আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাই-ফোঁটার প্রণামী।"

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জান্‌লাটি হঠাৎ এই একবার খু'লে গিয়েছিলো। তখন মনে হ'লো এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইলো।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হ'য়ে গেলো, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আমার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগ্‌লামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য সুরু ক'রে দিলে। কিন্তু এ কি এ! এই কি আমার স্বভাব! কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনো দিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের ক'রে দেখিয়ে দিলে—কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিলো না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিষ। অপদেবতা কেমন ক'রে আমার উপর ভর ক'রেচে—আজ আমি যা কিছু ক'র্‌চি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে ক'রে এসে আমাকে ব'ল্‌লে, "আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার

সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর-কিছুই নেই—বন্দেমাতরং।” আমি হাত জোড় ক’রে ব’ল্লুম্,“তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেবো—বন্দেমাতরং।”

পাঁচহাজার চাই? আচ্ছা পাঁচহাজার নিয়ে যাবো। কালই চাই? আচ্ছা কালই পাবে! কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচহাজার টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠ্‌বে—তার পরে মাতালের উৎসব,—অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল ক’র্‌তে থাক্‌বে, চোখের উপর আগুন ছুট্‌বে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জ্জন জাগ্‌বে, সাম্‌নে কি আছে কি নেই তা বুঝ্‌তেই পার্‌বো না,—তার পরে ট’ল্‌তে ট’ল্‌তে প’ড়্‌বো গিয়ে মরণের মধ্যে—সমস্ত আগুন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়্‌বে,—কিছুই আর বাকি থাক্‌বে না।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনো মতেই ভেবে পাচ্ছিলুম্ না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেলুম্।

ফি-বছর আমার স্বামী পূজোর সময় তাঁর বড়ো ভাজ আর মেজো ভাজকে তিনহাজার টাকা ক’রে প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হ’য়ে সুদে বাড়্‌চে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হ’য়েচে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার

ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়্বার ছোটো কুঠ্‌রির কোণে লোহার সিন্ধুক আছে, তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হ'য়েচে।

ফি-বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান এবারে তাঁর আর যাওয়া হ'লো না। এই জন্যই তো দৈবকে মানি। ঐ টাকা দেশ নেবেন ব'লেই আটক আছে—এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই? প্রলয়ঙ্করী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েচেন—ব'ল্‌চেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে,—আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম্, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়! মাগো, এই টাকা যার গেলো তার সামান্যই ক্ষতি হবে—কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর ক'রে নিলে!

এর আগে কতোদিন বড়োরাণী মেজোরাণীকে আমি মনে মনে চোর ব'লেচি—আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তারা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্চে, এই ছিলো আমার নালিশ। তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারী জিনিষপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার স্বামীকে ব'লেচি। তিনি তার কোনো জবাব না ক'রে চুপ্ ক'রে থাক্‌তেন। তখন আমার রাগ হ'তো, আমি ব'ল্‌তুম্, দান ক'র্‌তে হয় হাতে তুলে দান করো, কিন্তু চুরি ক'র্‌তে দেবে কেন? বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচ্‌কে হেসেছিলেন—আজ আমি আমার স্বামীর সিন্ধুক থেকে ঐ বড়োরাণীর মেজোরাণীর টাকা চুরি ক'র্‌তে চ'লেচি।

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর জামা কাপড় ছাড়েন, জামার পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের ক'রে নিয়ে লোহার সিন্ধুক খুল্‌লুম্। অল্প যে-টুকু শব্দ হ'লো, মনে হ'লো সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠ্‌লো। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত পা হিম হ'য়ে বুকের মধ্যে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

লোহার সিন্ধুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে সেইটে খুলে দেখ্‌লুম্ নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কতো গিনি আছে আমার কতো দরকার, সে তখন হিসেব ক'রবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিলো, সব কটা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধ্‌লুম্।

কম ভারী নয়। চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে প'ড়্‌লো। হয় তো নোটের তাড়া হ'লে সেটাকে এতো বেশি চুরি ব'লে মনে হ'তো না। এ যে সব সোনা।

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হ'য়ে ঢুক্‌তে হ'লো তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইলো না। এ ঘরে আমার কতো বড়ো অধিকার, চুরি ক'রে সব খোয়ালুম্।

মনে মনে জ'প্‌তে লাগ্‌লুম্, "বন্দেমাতরং—বন্দেমাতরং।" দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ। সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারো নয়।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্ব্বল হ'য়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর

থেকে বেরিয়ে গেলুম্,—অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে-বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে প'ড়ে রইলুম্—সেই মোড়কগুলো বুকে বাজ্‌তে লাগ্‌লো। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জ্জনী তুলে রইলো। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখ্‌তে পার্‌লুম্ না। আজ ঘরকে লুটেচি, দেশকেই লুটেচি—এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইলো না, দেশও হ'য়ে গেলো পর। আমি যদি ভিক্ষে ক'রে দেশের সেবা ক'র্‌তুম্, এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না ক'রেও ম'রে যেতুম্, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হ'তো পূজা, দেবতা তা গ্রহণ ক'র্‌তেন। কিন্তু চুরি তো পূজা নয়—এ জিনিষ কেমন ক'রে দেশের হাতে তুলে দেবো? চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে ব'স্‌লুম্ গো! নিজে ম'র্‌তে ব'সেচি কিন্তু দেশকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি?

এ টাকা লোহার সিন্ধুকে ফের্‌বার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্ধুক খোল্‌বার শক্তি আমার নেই। আমি তাহ'লে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যাবো। এখন সাম্‌নে রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কতোটাকা নিলুম্ তাই যে ব'সে ব'সে গুণ্‌বো, সে আমি লজ্জায় পার্‌লুম্ না। ও যেমন ঢাকা আছে তেম্‌নি ঢাকা থাক্‌, চুরির হিসেব ক'র্‌বো না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিলো না;

সমস্ত তারাগুলি ঝক্‌ঝক্‌ ক'র্‌চে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছিলুম্‌—দেশের নাম ক'রে ঐ তারাগুলি যদি একটি-একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি ক'র্‌তে হ'তো—অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি—তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা,—নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ—তাহ'লে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হ'তো। আজ আমি এই যে চুরি ক'রে আন্‌লুম্‌, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো – এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি,—বিশ্বাস চুরি, ধর্ম্ম চুরি!

ছাদের উপর প'ড়ে রাত্রি কেটে গেলো। সকালে যখন বুঝ্‌লুম্‌ আমার স্বামী এতোক্ষণে উঠে' চ'লে গেছেন তখন সর্ব্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চ'ল্‌লুম্‌। তখন মেজোরাণী ঘটিতে ক'রে তাঁর বারান্দার টবের গাছ ক'টিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই ব'লে উঠ্‌লেন—"ওলো ছোটোরাণী, শুনেছিস্‌ খবর?"

আমি চুপ্‌ ক'রে দাঁড়ালুম্‌, আমার বুকের মধ্যে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো—মনে হ'তে লাগ্‌লো, আঁচল বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঁচু হ'য়ে আছে, মনে হ'লো, এখনি আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দাময় ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ছড়িয়ে প'ড়্‌বে, নিজের ঐশ্বর্য্য চুরি ক'রে ফতুর হ'য়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী চাকরদের কাছেও ধরা প'ড়ে যাবে।

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "তোদের দেবীচৌধুরাণীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ্‌ ক'র্‌বে শাসিয়ে বেনামী চিঠি লিখেচে।"

আমি চোরের মতোই চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম্‌!

আমি ঠাকুরপোকে ব'ল্‌ছিলুম্‌ তোমার শরণাপন্ন হ'তে। দেবী প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও! আমরা তোমার 'বন্দেমাতরমে'র সিন্নি মান্‌চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক কাণ্ডই তো হ'লো, এখন, দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদ্‌টা ঘ'ট্‌তে দিয়ো না।

আমি কিছু না ব'লে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চ'লে গেলুম্‌। চোরা বালিতে পা দিয়ে ফেলেচি—আর ওঠ্‌বার জো নেই—এখন যতো ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌বো ততোই ডুব্‌তে থাক্‌বো।

এ টাকাটা এক্ষণি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারিনে—আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্চে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুম্‌ সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌চে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিলো না —শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে গেলুম্‌।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য ব'সে আছে। মনে হ'লো আমার মানসম্ভ্রম যা কিছু বাকি ছিলো সমস্ত যেন ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'রে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চ'লে গেলো।

নারীর চরম মর্য্যাদা ঐ বালকের সাম্‌নে আজ আমাকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিতে হবে! আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে ব'সে আলোচনা ক'র্‌চে? এর উপরে অল্প একটুখানিও আব্রু রাখ্‌তে দেয় নি!

পুরুষমানুষকে আমরা বুঝ্‌বো না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টান্‌বার পথ তৈরি ক'র্‌তে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভেঙে পথের খোয়া বিছিয়ে দিতে ওদের একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি ক'র্‌বার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকে চুরমার ক'র্‌তেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্ম্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও প'ড়্‌বে না—প্রাণের পরে দরদ নেই ওদের—ওদের যতো ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে! হায়রে, এদের কাছে আমি কেই বা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো।

কিন্তু আমাকে এমন ক'রে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হ'লো কি? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিলো নাকি? ছিলো বই কি। সেই খবর তো সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম্—আর সেই শুনেই তো আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ ক'র্‌তে পেরেছিলুম্। আমি আলো দেবো, আমি জীবন দেবো, আমি শক্তি দেবো, আমি অমৃত দেবো: সেই বিশ্বাসে—সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হ'য়ে প'ড়েছিলুম্। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ ক'রে তুল্‌তো

তাহ'লে আমি ম'রে গিয়েও বাঁচ্‌তুম্‌, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোক্‌সান হ'তো না।

আজ কি এরা ব'ল্‌তে চায় এ সমস্তই মিথ্যা কথা? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম্‌, যে-গান শুনে স্বর্গ হ'তে ধূলোয় নেমে এসেছিলুম্‌, সে কি এই ধূলোকে স্বর্গ ক'র্‌বার জন্যে নয়, সে কি স্বর্গকেই মাটি করার জন্যে?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে ব'ল্‌লে, "টাকা চাই রাণী!"

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো,—সেই বালক,—সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তো তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিলো—সেই মা, সে যে একই মা! আহা ঐ কচি মুখ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়ে-মানুষ, আমি ওর মায়ের জাত,—ও আমাকে ব'ল্‌লে কিনা, আমার হাতে বিষ তুলে দাও—আর আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেবো!

টাকা চাই রাণী!—রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হ'লো সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুল্‌তে পার্‌-ছিলুম্‌ না, থরথর ক'রে আমার আঙুলগুলো কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। তারপর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়া-গুলো যখন প'ড়্‌লো তখন সন্দীপের মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌লো। সে নিশ্চয় ভাব্‌লে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি

আছে। কি ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কি নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হ'লো ও যেন আমাকে মা'র্‌তে পারে। সন্দীপ ভাব্‌লে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর ক'র্‌তে ব'সেচি—ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবী দু'তিন্‌শো টাকা দিয়ে রফা ক'র্‌তে চাই। একবার মনে হ'লো, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক? ও যে রাজা।

অমূল্য জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "আর নেই, রাণীদিদি?"

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হ'লো আমি বুঝি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌বো। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধ'রে একটু কেবল ঘাড় নাড়্‌লুন্। সন্দীপ চুপ্ ক'রে রইলো—মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও ব'ল্‌লে না।

চ'লে যাবো ভাব্‌চি কিন্তু কিছুতেই আমার পা চ'ল্‌চে না—পৃথিবী দু-ফাঁক হ'য়ে আমাকে যদি টেনে নিতো তা-হ'লেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচ্‌তো।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজ্‌লো। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—এই কম কি! এতেই ঢের হবে! তুমি আমাদের বাঁচিয়েচো রাণীদিদি!

ব'লেই সে একটা মোড়ক খু'লে ফেল্‌লে—গিনিগুলো ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠ্‌লো।

এক মুহূর্ত্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেলো। তারও মুখ চোখ আনন্দে ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌তে লাগলো। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উলটো হাওয়ার

দম্‌কা সাম্‌লাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এলো। কি তার মৎলব ছিলো জানিনে। আমি বিদ্যুতের মতো অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লুম্‌—হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম্‌। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্‌ ক'রে ঠেক্‌লো, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে প'ড়ে গেলো—কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইলো না। এই প্রবল চেষ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিলো না—আমি চৌকির উপরে ব'সে প'ড়্‌লুম্‌। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো—সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না—আমার পায়ের ধূলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে ব'স্‌লো। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পার্‌লুন্‌ না—আমার কান্না ভেঙে প'ড়্‌লো। আমি দুই হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম্‌। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যর করুণ হাতের স্পর্শ যতোই পাই আমার কান্না ততোই ফেটে প'ড়্‌তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সাম্‌লে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয়নি এম্‌নি ভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে ব'সে গিনিগুলো রুমালে বাঁধ্‌চে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো—ছল্‌ছল্‌ ক'র্‌চে তার চোখ।

সন্দীপ অসঙ্কোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে ব'ল্‌লে, "ছ'হাজার টাকা।"

অমূল্য ব'ল্‌লে, "এতো টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপ বাবু। হিসেব ক'রে দেখেচি সাড়ে তিন হাজার টাকা হ'লেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখন-কার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?"

অমূল্য ব'ল্‌লে, "তা হোক্, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী—আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রাণীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।"

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে আমি ব'লে উঠ্‌লুম্ "না, না, ও-টাকা আমি আর ছুঁতে চাইনে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুসী তাই করো।"

সন্দীপ অমূল্যের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "মেয়েরা যেমন ক'রে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?"

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "মেয়েরা যে দেবী।"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "আমরা পুরুষেরা বড়ো জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই তো সত্য দান।"

এই ব'লে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "রাণী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হ'তো তাহ'লে আমি

এ ছুঁতুম্ না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিষ দিয়েচো।”

মানুষের বোধ হয় হু’টো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝ্‌তে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্চে, কিন্তু আমার আরেকটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেই জন্যে ও যে-মুহূর্ত্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধ’র্‌ছিলো না, সে ব’ল্‌লে, “রাণী তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পারো ?”

আমি রুমাল বের ক’রে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই আমার পায়ের কাছে ব’সে প’ড়ে আমাকে প্রণাম ক’রে ব’ল্‌লে, “দেবী তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যই ছুটে এসেছিলুম্, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় ক’রে নিয়েছি।—ব’লে মাথায় যেখানে লেগে-ছিলো সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে !”

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম্ ? সন্দীপ কি তুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম ক’র্‌তেই এসেছিলো, তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠ্‌লো, সে তো মনে হ’লো, অমূল্যও দেখ্‌তে পেয়েছিলো। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য্য সুর লাগাতে জানে যে তর্ক ক’র্‌তে পারিনে, সত্য দেখ্‌বার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে।

সন্দীপকে আমি যে-আঘাত ক'রেচি সে-আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ ক'রে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত ক'র্‌তে লাগ্‌লো।—সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম্‌ আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে, ধর্ম্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা ক'রে ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

আমারি মতো অমূল্যেরও মন ভুলে গেলো। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হ'য়েছিলো সে আবার বাধামুক্ত হ'য়ে উছ্‌লে উঠ্‌লো, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হ'য়ে গেলো।—সরল বিশ্বাসের কি স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হ'তে লাগ্‌লো! আমি পূজা দিলেম্‌, আমি পূজা পেলেম্‌, আমার পাপ জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠ্‌লো। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌লে, "বন্দে মাতরং।"

কিন্তু স্তবের বাণী তো সব সময়ে শুন্‌তে পাইনে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুক্‌তে পারিনে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি ক'রে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছা করে—কেবলি মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনিগে। আমার

অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে—সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে প'ড়ে থাক্‌তে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই,—ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হ'তে থাক্‌লেই আমি আর বাঁচিনে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোন্‌বার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে—আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্য আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এতো দরকার!

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সাম্‌নে ব'স্‌তে পারিনে—অথচ না-বসাটা এতোই বেশী লজ্জা যে সেও আমি পারিনে—আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন ক'রে বসি যে, তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেম্‌নি ক'রে ব'সে আছি তিনি খাচ্চেন এমন সময় মেজোরাণী এসে ব'স্‌লেন, ব'ল্‌লেন, "ঠাকুরপো, তুমি ঐ সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাওনি?"

আমার স্বামী ব'ল্‌লেন, "না, সময় পাইনি।"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "দেখো ভাই, তুমি বড়ো অসাবধান, ও টাকাটা—"

স্বামী হেসে ব'ল্‌লেন, "সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে!"

"যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি ?"

"আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তাহ'লে কোন্‌দিন তোমাকেও চুরি হ'তে পারে !"

"ওগো আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মতো জিনিষ তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।"

"সদর খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে সেই সঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবো।"

"দেখো ভাই, ভুলে বোসো না, তোমার যে-রকম ভোলা মন কিছুই বলা যায় না।"

"এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তাহ'লে আমারি টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরাণী ?"

"ঠাকুরপো, তোমার ঐ সব কথা শুন্‌লে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ ক'রে কথা কচ্চি ? তোমারি যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজ্‌বে না ? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেচেন তার মূল্য বুঝি আমি বুঝিনে ? আমি ভাই তোমাদের বড়োরাণীর মতো দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাক্‌তে পারিনে, দেবতা আমাকে যা দিয়েচেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি। কি লো ছোটোরাণী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো চুপ্ ক'রে রইলি ? জানো ভাই ঠাকুরপো, ছোটোরাণী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোষামোদ করি। তা তেমন দায়ে প'ড়্‌লে খোষামোদই

ক'র্‌তে হ'তো। কিন্তু তুমি কি আমাদের তেম্‌নি দেওর যে খোষামোদের অপেক্ষা রাখো? যদি হ'তে ঐ মাধব চক্রবর্ত্তীর মতো, তাহ'লে আমাদের বড়োরাণীরও দেবসেবা আজ ঘুচে যেতো, আধপয়সাটির জন্যে তোমার হাঁতে পায়ে ধরাধরি ক'রেই দিন কাট্‌তো। তাও বলি, তাহ'লে ওর উপকার হ'তো, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে ক'র্‌বার এতো সময় পেতো না।"

এম্‌নি ক'রে মেজোরাণী অনর্গল ব'কে যেতে লাগ্‌লেন, তারি মাঝে মাঝে ছেঁচ্‌কিটা ঘণ্টটা, চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চ'ল্‌তে থাক্‌লো। আমার তখন মাথা ঘুর্‌চে। আর তো সময় নেই, এখনি একটা উপায় ক'র্‌তে হবে,—কি হ'তে পারে, কি করা যেতে পারে, এই কথা যখন বারবার মনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি তখন মেজোরাণীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হ'তে লাগ্‌লো। বিশেষত আমি জানি মেজোরাণীর চোখে কিছুই এড়ায় না—তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন। কি দেখ্‌ছিলেন জানিনে, কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছিলো আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা প'ড়্‌ছিলো।

দুঃসাহসের অন্ত নেই—আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠ্‌লুম্—ব'লে উঠ্‌লুম্—"আসল কথা, আমার পরেই মেজোরাণীর যতো অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা!"

মেজোরাণী মুচ্‌কে হেসে ব'ল্‌লেন—"তা ঠিক্ ব'লেছিস্

লো, মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্ব্বনেশে। তা আমার কাছে ধরা প'ড়্‌তেই হবে, আমি তো আর পুরুষমানুষ নই! আমাকে ভোলাবি কি দিয়ে?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "তোমার মনে এতোই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে না-হয় জামিন রাখি, যদি কোনো লোক্‌সান করি তো কেটে নিয়ো।"

মেজোরাণী হেসে ব'ল্‌লেন, "শোনো একবার ছোটোরাণীর কথা শোনো। এমন লোক্‌সান আছে যা ইহকাল পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।"

আমাদের এই কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও ব'ল্‌লেন না। তাঁর খাওয়া হ'য়ে যেতেই তিনি বাইরে চ'লে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম ক'র্‌তে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামী গয়না ছিলো খাজাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিলো তার দাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজোরাণীর কাছে খুলে দিলুম্, ব'ল্‌লুম্, "মেজোরাণী, আমার এই গয়না রইলো তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো।"

মেজোরাণী গালে হাত দিয়ে ব'ল্‌লেন, "ওমা, তুই যে অবাক্ ক'র্‌লি! তুই কি সত্যি ভাবিস্ তুই আমার টাকা চুরি ক'র্‌বি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হ'চ্ছে না?"

আমি ব'ল্লুম্, "ভয় ক'র্‌তেই বা দোষ কি ? সংসারে কে কাকে চেনে বলো, মেজোরাণী !"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "তাই আমাকে বিশ্বাস ক'রে শিক্ষা দিতে এসেচো বুঝি ? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক্ নেই, গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর কি ? চারিদিকে দাসীচাকর ঘুর্‌চে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।"

মেজোরাণীর কাছ থেকে চ'লে এসেই বাইরের বৈঠকখানাঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম্। অমূল্যের সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরী ক'র্‌বার সময় ছিলো না। আমি সন্দীপকে ব'ল্লুম্, "অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে আপ্‌নাকে একবার—"

সন্দীপ কাষ্ঠ-হাসি হেসে ব'ল্‌লে, "অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা ক'রে দেখো না কি ? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তাহ'লে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো না।"

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম্। সন্দীপ ব'ল্‌লে, "আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ ক'রে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা ক'বার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে ; আমি সব মান্‌তে পারি হার মান্‌তে পারিনে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে ল'ড়্‌চি। বিধাতাকে হারাবো, আমি হার্‌বো না।"

তীব্রকটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত ক'রে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। অমূল্যকে ব'ল্‌লুম্, "লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।"

সে ব'ল্‌লে, "তুমি যা ব'ল্‌বে আমি প্রাণ দিয়ে ক'র্‌বো দিদি।"

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের ক'রে তার সাম্‌নে রেখে ব'ল্‌লুম্, "আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক্ বিক্রী ক'রে হোক্ আমাকে ছ'হাজার টাকা যতো শীঘ্র পারো এনে দিতে হবে।"

অমূল্য ব্যথিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "না দিদি না, গয়না বিক্রী বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ'হাজার টাকা এনে দেবো।"

আমি বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্‌লুম্, "ওসব কথা রাখো—আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স.—আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পর্শুর মধ্যে ছ'হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।"

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিক্‌টা আলোতে তুলে ধ'রে আবার বিষণ্ণ মুখে রেখে দিলে। আমি ব'ল্‌লুম্, "এই সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রী হবে না, সেই জন্যে আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্চি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ সবই যদি যায় সেও ভালো—কিন্তু ছ'হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।"

অমূল্য ব'ল্‌লে, "দেখো দিদি, তোমার কাছ থেকে এই যে

ছ'হাজার টাকা নিয়েচেন সন্দীপবাবু, এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'রেচি। ব'ল্‌তে পারিনে এ কি লজ্জা! সন্দীপবাবু বলেন দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জ্জন ক'র্‌তে হবে। তা হয় তো হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা,—দেশের জন্যে ম'র্‌তে ভয় করিনে, মার্‌তে দয়া করিনে এই শক্তি পেয়েচি, কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পার্‌চিনে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত—ওঁর একতিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাক্সে ছিলো টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই—নইলে 'বন্দেমাতরং' মন্ত্র কিসের!

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অমূল্য উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই সব কথা ব'ল্‌বার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব'লেচেন, আত্মাকে তো কেউ মার্‌তে পারে না। কাউকে বধ করা ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেই রকম একটা কথা! টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারো আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারোই নয় তখন তোমার অকর্ম্মণ্য ছেলের হাতে না প'ড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তাহ'লে তাকে নিন্দা ক'র্‌লেই সে কি নিন্দিত হবে?"

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভ'য়ে আমার বুক কাঁপ্‌তে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক্, ম'র্‌তে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক্। কিন্তু আহা এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের আশীর্ব্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা ক'র্‌তে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাস্‌তে হাস্‌তে তার সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি এই সাপটা কি ভয়ঙ্কর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেচে—আমি নিজে তার হাতে ম'র্‌তে পারি কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাবো।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে ব'ল্‌লুম্, "তোমাদের দেশ-সেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?"

অমূল্য সগর্ব্বে মাথা তুলে ব'ল্‌লে—"আছে বই কি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপ বাবুকে ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চ'ড়্‌তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সঙ্কুচিত হন না—তাঁর এই মর্য্যাদা তাঁকে রাখ্‌তে হয়—তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন সংসারে যারা ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যের সম্মোহনই হ'চ্চে তাদের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয় সে হ'চ্চে আত্মঘাত।"

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়লেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর

শাল চাপা দিলুম্। সন্দীপ বাঁকাস্বরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি ?"

অমূল্য একটু লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "না আমাদের কথা হ'য়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "না অমূল্য, এখনো হয় নি।"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "তাহ'লে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান ?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "হাঁ।"

"তাহ'লে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—"

"সে আজ নয়—আমার সময় হবে না।"

সন্দীপের চোখ দু'টো জ্বলে উঠ্‌লো,—ব'ল্‌লে "কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট ক'র্‌বার সময় নেই ?"

ঈর্ষ্যা ! প্রবল যেখানে দুর্ব্বল, সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাক্‌তে পারে কি ? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই ব'ল্‌লুম্, "না, আমার সময় নেই।"

সন্দীপ মুখ কালী ক'রে চ'লে গেলো। অমূল্য কিছু উদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'ল্‌লে, "রাণীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হ'য়েচেন।"

আমি তেজের সঙ্গে ব'ল্‌লুম্, "বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে ব'লে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না-বিক্রীর কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে ব'ল্‌তে পার্‌বে না।"

অমূল্য ব'ল্‌লে, "না, ব'ল্‌বো না।"

"তাহ'লে আর দেরি ক'রো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চ'লে যাও।"

এই ব'লে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম্। বাইরে এসে দেখি, বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝ্‌লুম্ এখনি সে অমূল্যকে ধ'র্‌বে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাক্‌তে হ'লো—সন্দীপবাবু, কি ব'ল্‌তে চাচ্ছিলেন?"

"আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—"

আমি ব'ল্‌লুম্, "আছে সময়।"

অমূল্য চ'লে গেলো। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ ব'ল্‌লেন, "অমূল্যের হাতে একটা কি বাক্স দিলে ওটা কিসের বাক্স?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারেনি। আমি একটু শক্ত ক'রেই ব'ল্‌লুম্, "আপনাকে যদি ব'ল্‌বার হ'তো তাহ'লে আপনার সাম্‌নেই দিতুম্।"

"তুমি কি ভাব্‌চো অমূল্য আমাকে ব'ল্‌বে না?"।

"না, ব'ল্‌বে না।"

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইলো না, একেবারে আগুন হ'য়ে উঠে ব'ল্‌লে,"তুমি মনে ক'র্‌চো তুমি আমার উপর প্রভুত্ব ক'র্‌বে, পার্‌বে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই, তাহ'লে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত ক'র্‌বে, আমি থাক্‌তে সে হবে না।"

দুর্ব্বল, দুর্ব্বল! এতোদিন পরে সন্দীপ বুঝ্‌তে পেরেচে ও আমার কাছে দুর্ব্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও

বুঝ্‌তে পেরেচে আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি খাট্‌বে না ;—আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেই জন্যেই আজ এই আস্ফালন। আমি কথা না ব'লে একটুখানি কেবল হাস্‌লুম্‌। এতোদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েচি—আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে !

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "আমি জানি তোমার ও-বাক্স গয়নার বাক্স।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "আপনি যেমন-খুসি আন্দাজ করুন আমি ব'ল্‌বো না।"

"তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করো ? জানো, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশ থেকে সরে' গেলে ও কিছুই নয় !"

"যেখানে ও তোমার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে তোমার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।"

"মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে কথা ভুল্‌লে চ'ল্‌বে না। সে তোমার দেওয়াই হ'য়ে গেছে।"

"দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তাহ'লে সেই গয়না দেবতাকে দেবো। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেবো কেমন ক'রে ?"

"দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন-ক'রে ফ'স্‌কে যাবার চেষ্টা ক'রো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হ'য়ে যাক্, তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেবো।"

"যে-মুহূর্ত্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি ক'রে সন্দীপের হাতে দিয়েচি সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চ'লে গেছে। কেবল যে আমারি সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানাকড়ার মতো সস্তা হ'য়ে গেছি তা নয়—আমার পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো ক'রে খেল্‌বার আর জায়গা পাচ্চে না,—মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না। সেই জন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্ত্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগ্‌চে।"

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে ব'সে রইলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে' উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো—বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ সে উঠি-উঠি ক'র্‌চে—এখনি সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধর্‌বে। আমার বুকের ভিতরে দুল্‌তে লাগ্‌লো—সমস্ত শরীরের শির দব্‌দব্ ক'র্‌চে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌চে, বুঝ্‌লুম্ আর-একটু ব'সে থাক্‌লে আমি আর উঠ্‌তে পার্‌বো না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই

দরজার দিকে ছুটলুম্। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠ্‌লো—"কোথায় পালাও রাণী ?"

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধ'র্‌তে এলো। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে ব'স্‌লো। আমি বইয়ের শেল্‌ফের দিকে মুখ ক'রে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম্।

আমার স্বামী ঘরে ঢোক্‌বামাত্রই সন্দীপ ব'লে উঠ্‌লো, "ওহে নিখিল, তোমার শেল্‌ফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষিরাণীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা ব'ল্‌ছিলুম্—মনে আছে তো ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা, তর্জ্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই ? বলো কি, মনে নেই! সেই যে—

She should never have looked at me.
If she meant I should not love her !
There are plenty...men you call such,
I suppose...she may discover
All her soul to, if she pleases,
And yet leave much as she found them ;
But I'm not so, and she knew it
When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচ্‌ড়ে-মিচ্‌ড়ে তার একটা বাংলা ক'রেছিলুম্ কিন্তু সেটা এমন হ'লো না "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে

পান সুধা নিরবধি।" এক সময়ে ঠাউরেছিলুম্, কবি হ'লেম বুঝি, আর দেরি নেই,—বিধাতা দয়া ক'রে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন—কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইনস্পেক্টর না হ'তো তাহ'লে নিশ্চয় কবি হ'তে পার্‌তো, সে খাসা তর্জ্জমাটি ক'রেছিলো—প'ড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা প'ড়্‌চি, যে দেশ জিয়ো-গ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

আমায় ভালো বাস্‌বেনা সে এই যদি তার ছিলো জানা,
তবে কি তার উচিত ছিলো আমার পানে দৃষ্টি হানা?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই ধরাধামে
(যদি চ ভাই আমি তাদের গণিনেকো মানুষ নামে)—
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিতো প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইতো খাড়া যেমন ছিলো তেমনি ফাঁকা।
আমি তো নই তাদের মতন সে কথা সে জান্‌তো মনে
যখন মোরে বাঁধ্‌লো ধ'রে বিদ্ধ ক'রে নয়ন-কোণে।

না মক্ষিরাণী তুমি মিথ্যে খুঁজ্‌চো—নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা-পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচে, বোধ হয়, ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম্ কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হ'চ্ছে যেন "কাব্যজ্বরো মনুষ্যানাং" আমাকে ধ'র্‌বে-ধ'র্‌বে ক'র্‌চে!

আমার স্বামী ব'ল্‌লেন, "আমি তোমাকে সতর্ক ক'রে দিতে এসেচি সন্দীপ!"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "কাব্যজ্বর সম্বন্ধে?"

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে ব'ল্‌লেন, "কিছুদিন ধ'রে ঢাকা থেকে মৌলবী আনাগোনা ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেচে—এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে-ভিতরে ক্ষেপিয়ে তোল্‌বার উদ্যোগ চ'লেচে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হ'য়ে আছে, হঠাৎ একটা কিছু উৎপাত ক'র্‌তে পারে।"

"পালাতে পরামর্শ দাও নাকি ?"

"আমি খবর দিতে এসেচি পরামর্শ দিতে চাইনে।"

"আমি যদি এখানকার জমিদার হ'তুম্ তাহ'লে ভাব্‌নার কথা হ'তো মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্বিগ্ন ক'রে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্বেগের চাপ দাও তাহ'লে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জানো, তোমার দুর্ব্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্য্যন্ত তুমি দুর্ব্বল ক'রে তুলেচো ?"

"সন্দীপ আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চ'ল্‌তো। ওটা বৃথা হ'চ্চে। আর একটি কথা আমার ব'ল্‌বার আছে। তোমরা কিছু দিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত ক'র্‌চো। আর চ'ল্‌বে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চ'লে যেতে হ'চ্চে।

"মুসলমানের ভয়ে, না, আরো কোনো ভয় আছে ?"

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা—আমি সেই ভয় থেকেই ব'ল্‌চি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্চি সেই সময়

তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই! আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাক্‌তে পারো, তাতে কোনো বাধা নেই!"

"আচ্ছা পাঁচদিন ভাব্‌বার সময় পাওয়া গেলো। ইতিমধ্যে মক্ষিরাণী, তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জন-গান ক'রে নেওয়া যাক্! হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ্‌ ক'রে নিই,—চুরি তোমারই—তুমি আমারই গানকে তোমার গান ক'রেচো—না-হয় নাম তোমার হ'লো কিন্তু গান আমার।"

এই ব'লে তার বেস্থর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধ'র্‌লে,—

"মধুঋতু নিত্য হ'য়ে রইলো তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সেই স্থধু যায়, ফুল-ফোটা তো ফুরোয় না হায়,
ঝ'র্‌বে যে ফুল সেই কেবলি ঝ'রে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে, তখন কতো দিয়েছি গান;
এখন আমার দূরে-যাওয়া, এরো কিগো নাই কোনো দান?
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে॥"

সাহসের অন্ত নেই—সে সাহসের কোনো আবরণও নেই—একেবারে আগুনের মতো নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না,—তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম্। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন

চ'লে যাচ্চি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লে, "রাণীদিদি তুমি কিছু ভেবো না। আমি চ'ল্‌লুম্‌, কিছুতেই নিষ্ফল হ'য়ে ফির্‌বো না।"

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লুম্‌, "অমূল্য, নিজের জন্য ভাব্‌বো না, যেন তোমাদের জন্যে ভাব্‌তে পারি।"

অমূল্য চ'লে যাচ্ছিলো, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "অমূল্য তোমার মা আছেন?"

"আছেন।"

"বোন?"

"নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।"

"যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও, অমূল্য।"

"দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখ্‌চি আমার বোনকেও দেখ্‌চি।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।"

সে ব'ল্‌লে, "সময় হবে না, দিদিরাণী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাবো।"

"তুমি কী খেতে ভালোবাসো, অমূল্য?"

"মায়ের কাছে থাক্‌লে পৌষে পেট ভ'রে পিঠে খেতুম্‌। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরী পিঠে খাবো দিদিরাণী!"

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে-জগতে আমি একদিন বাস ক'র্‌তুম্‌ সে যেন মরে' ভূত হ'য়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই সব জিনিষপত্র দখল ক'রে ব'সে আছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌ মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন একমুহূর্ত্তে অজানা হ'য়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চ'ল্‌ছিলো, আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে, যে-খাদ এখনো কাটা হয়নি তখন বিষম ধাঁদা লেগে যায়; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয়; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমিও বুঝি আরেকজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝ্‌তে পার্‌চি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত সুরু ক'রেচে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাক্‌তুম্‌ তাহ'লে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে ব'ল্‌তুম্‌, এখান থেকে চ'লে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠেচি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চ'লে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে প'ড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোটো হ'য়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিষ ছিল—সে তো কেবল

আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেই জন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম্ না—দিতে গেলেই মনে হয় আমার দেবতাকে অপমান ক'রচি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারবো না। আমি হয় তো অদ্ভুত। সেই জন্যেই হয় তো ঠ'কলুম্। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কি ক'রে?

যে-সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি ক'রে তোলে আমি সেই-সত্যের দীক্ষা নিয়েচি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন ক'রে ছিন্ন ক'রতে হ'লো। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত ক'রে সেই-মুক্তি আমি পাবো। কিন্তু যখন পাবো তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই-মুক্তির স্বাদ এখনি পাচ্চি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখী গান গেয়ে উঠ্‌চে। যে-বিমলা মায়ায় তৈরি, সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে ব'লে উঠ্‌চে।

মাষ্টার মশায়ের কাছে খবর পেলুম্ সন্দীপ হরিশকুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধূম ক'রে মহিষমর্দ্দিনী পূজোর আয়োজন ক'র্‌চে। এই পূজোর খরচা হরিশকুণ্ডু আর প্রজাদের কাছ থেকে আদায় ক'র্‌তে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশ মশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা

করা হ'চ্চে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হ'য়ে গেছে।' সন্দীপ বলে, "দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে; পিতামহরা যে-দেবতার সৃষ্টি ক'রেছিলেন, পৌত্রেরা যদি সেই-দেবতাকে আপনার মতো না ক'রে তোলে তাহ'লে যে নাস্তিক হ'য়ে উঠ্‌বে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক ক'রে তোলাই আমার মিশন্, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্ত্তা।"

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আস্‌চি সন্দীপ হ'চ্চে আইডিয়ার যাদুকর,—সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেল্‌কি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হ'তো তাহ'লে, নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ ক'রে ও পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তো। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাক্‌তে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতোবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে, প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে সত্যকে পেয়েচি,—তার এক-সৃষ্টির সঙ্গে আরেক-সৃষ্টির যতোই বিরোধ থাক্।

যাই হোক্ দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়ি-খানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌বো না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগ্‌তে চাচ্চে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো

হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় ক'র্‌তে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো ক'রে দেখে, যে-মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজ্‌বে।

বিমলার সাম্‌নেই সন্দীপকে ব'লেচি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চ'লে যেতে হবে। এতে হয় তো বিমলা এবং সন্দীপ দু'জনেই আমার মৎলবকে ভুল বুঝ্‌বে। কিন্তু এই ভুল বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক্।

ঢাকা থেকে মৌলবী প্রচারকের আনাগোনা চ'ল্‌চে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা ক'র্‌তো। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু জবাই দেখা দিলো। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝ্‌লুম্, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম ক'রে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান-প্রধান হিন্দুপ্রজাকে ডাকিয়ে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম্। ব'ল্‌লুম্, "নিজের ধর্ম্ম আমরা রাখ্‌তে পারি। পরের ধর্ম্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম ব'লে শাক্ত তো রক্তপাত ক'রতে ছাড়ে না।

উপায় কি? মুসলমানকেও নিজের ধর্ম্মমতে চ'ল্‌তে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।"

তা'রা ব'ল্‌লে, "মহারাজ, এতোদিন তো এ সব উপসর্গ ছিলো না।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "ছিলো না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা ক'রেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।"

তা'রা ব'ল্‌লে, "না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না ক'র্‌লে কিছুতেই থাম্‌বে না।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "শাসনে গোহিংসা তো থাম্‌বেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে।"

এদের মধ্যে একজন ছিলো, ইংরেজি-পড়া; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেচে। সে ব'ল্‌লে "দেখুন, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান —এদেশে গোরু যে—

আমি ব'ল্‌লুম্‌,—"এদেশে মহিষেও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য ক'রে বেড়াই তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌লে ধর্ম্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগ্‌ড়াটাই প্রবল হ'য়ে উঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।"

ইংরেজি-পড়া ব'ল্‌লে, "এর পিছনে কে আছে সেটা কি

দেখ্‌তে পাচ্চেন না? মুসলমানরা জান্‌তে পেরেছে তাঁদের শাস্তি হবে না—পাঁচুড়েতে কি কাণ্ড তারা ক'রেচে শুনেছেন তো?"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "এই যে মুসলমানদের অস্ত্র ক'রে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হ'চ্চে—এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েচি—ধর্ম্ম যে এম্‌নি ক'রেই বিচার করেন। আমরা যা এতোকাল ধ'রে জমিয়েচি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।"

ইংরাজি-পড়া ব'ল্‌লে, "আচ্ছা ভালো, তাই খরচ হ'য়ে যাক্‌। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে—আমাদেরই এবার জিৎ—যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ ক'রেচি, এতোদিন ওরা রাজা ছিলো আজ ওদেরেও আমরা ডাকাতি ধরাবো। একথা ইতিহাসে কেউ লিখ্‌বে না কিন্তু একথা চিরদিন আমাদের মনে থাক্‌বে।"

এদিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হ'য়ে প'ড়্‌লুম্‌। শুন্‌চি চক্রবর্ত্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশান-ঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধূম ক'রে সেটাকে দাহ ক'রেচে—তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিলো! এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার ক'র্‌বে ব'লে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিলো। আমি ব'লেছিলুম্‌, "যদি কেবল আমার এই ক'টি টাকা লোকসান যেতো খেদ ছিলো না, কিন্তু

তোমরা যদি কারখানা খোলো তবে অনেক গরীবের টাকা মারা যাবে এইজন্যেই আমি শেয়ার কিন্‌বো না।”

কেন মশায়? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার ক'র্‌লে দেশের হিতও হ'তে পারে, কিন্তু দেশের হিত ক'র্‌বো ব'ল্‌লেই তো কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম্ তখন আমাদের ব্যবসা চলেনি,—আর ক্ষেপে উঠেচি ব'লেই কি আমাদের ব্যবসা হুহু ক'রে চ'ল্‌বে?

এক কথায় বলুন্ না আপনি শেয়ার কিন্‌বেন না।

কিন্‌বো যখন তোমাদের ব্যবসাকে ব্যবসা ব'লে বুঝ্‌বো। তোমাদের আগুন জ্ব'ল্‌চে ব'লেই যে তোমাদের হাঁড়িও চ'ড়্‌বে সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ্‌চিনে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবী আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর সেই যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি ক'র্‌তে ব'সেছিলুম্ তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক'বছর ধ'রে জাভা মরিশস্ থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম্; সরকারী কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হ'তে পারে তার কিছুই বাকি রাখিনি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কি হ'লো? সে আমার এলাকার চাষীদের চাপা অট্টহাস্য। আজো সেটা চাপা র'য়ে গেছে। তার পরে সরকারী কৃষিপত্রিকা তর্জ্জমা ক'রে যখন ওদের কাছে জাপানী সিম কিম্বা বিদেশী কাপাসের চাষের

কথা ব'ল্‌তে গেছি তখন দেখ্‌তে পেয়েছি সে পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিলো না, 'বন্দেমাতরং' মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে আমার কলের জাহাজ—দূর হোক্‌ সে সব কথা তুলে লাভ কি? দেশহিতের যে আগুন এরা জ্বাল্‌লে তাতে আমারি কুশ-পুত্তলি দগ্ধ হ'য়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা!

* * * *

এ কি খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে! কাল রাত্রে সদরখাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হ'য়েছিলো আজ ভোরে নৌকা ক'রে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে ব'লে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট ক'রে তাড়াবন্দী ক'রে রেখেছিলো। অর্দ্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দ্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হ'য়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডাকাতরা কেবল ছ' হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চ'লে এসেচে। অনায়াসেই সব টাকাই নিয়ে আস্‌তে পার্‌তো। যাই হোক্‌, ডাকাতের পালা শেষ হ'লো, এইবার পুলিশের পালা আরম্ভ হবে। টাকা তো গেছেই এখন শান্তিও থাক্‌বে না।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজো রাণী এসে ব'ল্‌লেন, "ঠাকুরপো, এ কি সর্ব্বনাশ!"

আমি উড়িয়ে দেবার জন্য ব'ল্‌লুম্‌, "সর্ব্বনাশের এখনো অনেক বাকী আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে-পরে কাটাতে পার্‌বো।"

না ভাই, ঠাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এতো রাগ কেন? ঠাকুরপো, তুমি না-হয় ওদের একটু মন রেখেই চলো না! দেশশুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পার্‌বো না তো।

এই সেদিন শুন্‌লুম্‌ নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা-এক কাণ্ড ক'রে ব'সেচে। ছি ছি! আমি তো ভয়ে মরি! ছোটোরাণী মেমের কাছে প'ড়েচে ওর তো ভয় ডর নেই—আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি ক'ল্‌কাতায় যাও—এখানে থাক্‌লে ওরা কোন্‌ দিন কি ক'রে বসে!

মেজোরাণীদিদির ভয় ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধা-বর্ষণ ক'র্‌লে! অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচ্‌বে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ যে টাকাটা রেখেচো ওটা ভালো ক'র্‌চো না। কোনদিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে—আমি টাকার জন্যে ভাবিনে ভাই—কি জানি—

আমি মেজোরাণীকে ঠাণ্ডা ক'র্‌বার জন্যে ব'ল্‌লুম্‌, "আচ্ছা,

ও-টাকাটা বের ক'রে এখনি আমাদের খাতাঞ্জীখানায় পাঠিয়ে দিচ্চি! পশুর্দিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিয়ে আস্‌বো।"

এই ব'লে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা ব'ল্‌লে—"আমি কাপড় ছাড়্‌চি।"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন—"এই সকালবেলাতেই ছোটোরাণীর সাজ হ'চ্চে! অবাক ক'র্‌লে! আজ বুঝি ওদের 'বন্দে-মাতরমে'র বৈঠক ব'স্‌বে! ওলো, ও দেবীচৌধুরাণী, লুটের মাল বোঝাই হ'চ্চে নাকি?"

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে—এই ব'লে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ তো ক'র্‌চি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দ্দারকে।

সে কি কথা? ঐ তো জখম হ'য়েচে!

জখম কিছু নয়—পায়ের চাম্‌ড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত প'ড়েচে—সে ওর নিজেরই কীর্ত্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ ক'র্‌তে পারিনে—ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী, সে কথা মান্‌তে রাজি আছি কিন্তু তাই ব'লেই যে চুরি ক'র্‌তে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেচি

পঁচিশ বৎসর যে-লোক বিশ্বাস রক্ষা ক'রে এসেচে সেও এক-দিন হঠাৎ--

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পার্‌বো না।

আপনি দেবেন কেন ? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ'হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকা ফেলে রাখ্‌লে কেন ?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই ব'লুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়, এদিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যতো চুরি ডাকাতি হয়েচে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন ক'রে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজ্‌রি লেখাতে পারে ইন্‌স্পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "কাসেমকে এনেচেন ?"

তিনি ব'ল্‌লেন, "না, সে থানায় আছে—এখনি ডিপুটিবাবু তদন্ত ক'র্‌তে আস্‌বেন।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "আমি তাকে দেখ্‌তে চাই।"

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ব'ল্‌লে, "খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করিনি।"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "কাসেম আমি তোমাকে সন্দেহ করিনে। ভয় নেই তোমার—বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘ'ট্‌তে দেবো না।"

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা ক'র্‌তে পার্‌লে না—কেবল খুবই অত্যুক্তি ক'র্‌তে লাগ্‌লো—চারশো পাঁচশো লোক, এতো-বড়ো-বড়ো বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝ্‌লুম্‌ এ সমস্ত বাজে কথা; হয় ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেচে, নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেচে। ওর ধারণা, হরিশকুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা এ তারই কাজ—এমন কি, তাদের এক্রাম্‌ সর্দ্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুন্‌তে পেয়েচে ব'লে তার বিশ্বাস।

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "দেখ্‌ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর ক'রে খবরদার পরের নাম জড়াস্‌নে। হরিশকুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোল্‌বার ভার তোর উপর নেই।"

বাড়ি ফিরে এসে মাষ্টার মশায়কে ডেকে পাঠালুম্‌। তিনি মাথা নেড়ে ব'ল্‌লেন—"আর কল্যাণ নেই। ধর্ম্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি—এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হ'য়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাক্‌বে না।"

আপনি কি মনে করেন, এ কাজ—

আমি জানিনে কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেচে। দাও, দাও, তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনি বিদায় ক'রে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েচি—পর্শু এরা সব যাবে।

দেখো, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি ক'ল্‌কাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে দেখ্‌চেন, সব মানুষের, সব জিনিষের, ঠিক পরিমাণ বুঝ্‌তে

পারচেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবী দেখিয়ে দাও—মানুষকে, মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন্।

আমিও ঐ কথাই ভাব্ছিলুম্।

কিন্তু আর দেরী কোরো না। দেখো নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরী হ'য়ে উঠ্চে, এইজন্যে পলিটিক্সেও ধর্ম্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চ'ল্বে না। আমি জানি য়ুরোপ একথা মনের সঙ্গে মানে না কিন্তু তাই ব'লেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মান্বো না। সত্যের জন্যে মানুষ ম'রে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে, তা'হলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হ'য়ে উঠুক্, সয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝ্খানে! কিন্তু বিদেশ থেকে এ কি পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ ক'র্লে?

সমস্ত দিন এই সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেলো। শ্রান্ত হ'য়ে রাত্রে শুতে গেলুম্। সেই টাকাটা আজ বের না ক'রে কাল সকালে বের ক'রে নেবো স্থির ক'রেচি।

রাত্রে কখন্ একসময়ে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুন্তে পাচ্চি। বুঝি কেউ কাঁদ্চে।

থেকে থেকে বাদ্লা রাতের দম্কা হাওয়ার মতো চোখের জলে ভরা এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস্ শুন্তে পাচ্চি। আমার মনে হ'লো, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না!

আমার ঘরে আর-কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে প'ড়্লুম্। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটীর উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে' র'য়েচে।

এসব কথা লিখ্তে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্ম্মের মধ্যে ব'সে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ ক'র্চেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ—তারি মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালোমন্দ একটা কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই! কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই যে ব্যথার উৎস উঠ্চে এর কি কোনো নাম আছে! সেই নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখ্লুম্ তখন আমার মন সভয়ে ব'লে উঠ্লো, আমি এ'কে বিচার ক'রবার কে। হে প্রাণ, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য র'য়েছে আমি জোড়হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাব্লুম্, ফিরে যাই। কিন্তু পার্লুম্ না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে ব'সে তার মাথার উপর হাত রাখ্লুম্। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হ'য়ে উঠ্লো—তার পরেই সেই কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় ব'য়ে যেতে লাগলো। মানুষের

হৃদয়ের মধ্যে এতো কান্না যে কোথায় ধ'র্‌তে পারে সে তো ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগ্‌লুম্‌। তার পরে কখন একসময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা দুটো টেনে নিলে—বুকের উপরে এম্‌নি ক'রে চেপে ধ'র্‌লে যে, আমার মনে হ'লো সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

আজ সকালে অমূল্যর ক'ল্‌কাতা থেকে ফের্‌বার কথা। বেহারাকে ব'লে রেখেচি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু স্থির থাক্‌তে পার্‌চি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে ব'সে রইলুম্।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচ্‌বার জন্যে ক'ল্‌কাতায় পাঠালুম্ তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিলো না। এ-কথা একবারো আমার বুদ্ধিতে এলোই না যে, সে ছেলেমানুষ, অতো টাকার গয়না কোথাও বেচ্‌তে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ ক'র্‌বে। মেয়েমানুষ আমরা এতো অসহায় যে, আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা ম'র্‌বার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড়ো অহঙ্কার ক'রে ব'লেছিলুম্, অমূল্যকে বাঁচাবো। যে নিজে তলিয়ে যাচ্চে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায়, হায়, আমিই বুঝি ওকে মার্‌লুম্! ভাই আমার, আমি তোর এম্‌নি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাই-ফোঁটা দিলুম্ সেইদিনই বুঝি যম মনে মনে হাস্‌লে। আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফির্‌চি আজ!

আমার আজ মনে হ'চ্চে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন

অমঙ্গলের প্লেগে ধরে, হঠাৎ কোথা হ'তে তার বীজ এসে প'ড়ে, আর, একরাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তার ছোঁয়াচ যে বড়ো ভয়ানক! সে যে বিপদের মশালের মতো, নিজে পুড়্‌তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

ন'টা বাজ্‌লো। আমার কেমন বোধ হ'চ্চে, অমূল্য বিপদে প'ড়েছে, ওকে পুলিসে ধ'রেছে। আমার গয়নার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল প'ড়ে গেছে—কা'র বাক্স ও কোথা পেলে, তার জবাব তো শেষকালে আমাকেই দিতে হবে, সমস্ত পৃথিবীর লোকের সাম্‌নে কি জবাবটা দেবো? মেজোরাণী, এতোকাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞাই ক'রেচি! আজ তোমার দিন এলো! তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধ'রে শোধ তুল্‌বে। হে ভগবান্, এইবার আমাকে বাঁচাও—আমার সমস্ত অহঙ্কার ভাসিয়ে দিয়ে মেজোরাণীর পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌বো!

আর থাক্‌তে পার্‌লুম্ না—তখনি বাড়ির ভিতরে মেজো-রাণীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম্। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্দুরে ব'সে পান সাজ্‌চেন, পাশে থাকো ব'সে। থাকোকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্যে মনটা সঙ্কুচিত হ'লো—তখনি সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোরাণীর পায়ের কাছে প'ড়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলুম্। তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—"ও কি লো ছোটোরাণী, তোর হ'লো কি? হঠাৎ এতো ভক্তি কেন?"

আমি ব'ল্লুম্, "দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ ক'রেচি, করো দিদি, আশীর্ব্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই! আমার ভারি ছোটো মন!"

ব'লেই তাঁকে আবার প্রণাম ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম্। তিনি পিছন থেকে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, "বলি ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, একথা আগে বলিস্‌নি কেন? আমার এখানে দুপুরবেলা তোর নিমন্তন্ন রইলো। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস্‌নে!"

ভগবান, এমন কিছু কর যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নতুন হ'তে পারিনে কি? সব ধুয়ে-মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা কর, প্রভু!

বাইরে বৈঠকখানা ঘরে যখন ঢুক্‌তে যাচ্চি এমন সময় সেখানে সন্দীপ এসে উপস্থিত হ'লো। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠ্‌লো। আজ সকালের আলোয় তার যে-মুখ দেখ্‌লুম্ তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিলো না। আমি ব'লে উঠ্‌লুম্,—"আপনি যান এখান থেকে!"

সন্দীপ হেসে ব'ল্‌লে, "অমূল্য তো নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।"

পোড়া কপাল! যে-অধিকার আমিই দিয়েচি সে-অধিকার আজ ঠেকাই কি ক'রে? ব'ল্লুম্, "আমার একলা থাক্‌বার দরকার আছে।"

রাণী, আর-একজন লোক ঘরে থাক্‌লেও একলা থাকার

ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক,—আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময়ে আস্‌বেন, আজ সকালে আমি—

অমূল্যর জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌চেন ?

আমি বিরক্ত হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ ক'র্‌চি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের ক'রে ঠক্ ক'রে পাথরের টেবিলের উপর রাখ্‌লে।

আমি চ'ম্‌কে উঠ্‌লুম্, "তাহ'লে অমূল্য যায় নি ?"

কোথায় যায় নি ?

ক'ল্‌কাতায় ?

সন্দীপ একটু হেসে ব'ল্‌লে, "না।"

বাঁচ্‌লুম্! আমার ভাইফোঁটা বাঁচ্‌লো! আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যান্তই পৌঁছক্—অমূল্য রক্ষা পাক্!

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ ক'রে ব'ল্‌লে, "এতো খুসী, রাণী? গয়নার বাক্সর এতো দাম? তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে তো ফেলেচো, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও ?

অহঙ্কার ম'র্‌তে ম'র্‌তেও ছাড়ে না—ইচ্ছে হ'লো দেখিয়ে দিই এ গয়নার পরে আমার শিকি পয়সার মমতা নেই। আমি ব'ল্‌লুম্, "এ-গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান না।"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "আজ বাংলা দেশে যেখানে যতো ধন আছে সমস্তর পরেই আমার লোভ। লোভের মতো এতো বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র, লোভ তাদের ঐরাবত। তাহ'লে এ সমস্ত গয়না আমার?"

এই ব'লে, সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো। তার চোখের গোড়ায় কালী প'ড়েচে, মুখ শুক্‌নো, উস্কখুস্ক চুল—এক-দিনেই তার তরুণ বয়সের লাবণ্য যেন ঝ'রে গিয়েচে। তাকে দেখ্‌বামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কাম্‌ড়ে উঠ্‌লো।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে ব'ল্‌লে, "আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের ক'রে এনেচেন?"

গয়নার বাক্স তোমারি না কি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে, "তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদ-বিচার তো তোমার বড়ো সূক্ষ্ম হে অমূল্য! তুমিও ম'র্‌বার আগে ধর্ম্মপ্রচারক হ'য়ে ম'র্‌বে দেখ্‌চি।"

অমূল্য চৌকির উপর ব'সে প'ড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখ্‌লে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে ব'ল্‌লুম্, "অমূল্য, কি হ'য়েচে?"

তখনি সে দাঁড়িয়ে উঠে ব'ল্‌লে, "দিদি, এ গয়নার বাক্স

আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেবো এই আমার সাধ ছিলো—সন্দীপ বাবু তা জানতেন—তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "কি হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে—ও যাক্‌ না, তাতে ক্ষতি কি ?"

অমূল্য বিস্মিত হ'য়ে ব'ল্‌লে, "যাবে কোথায় ?"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "এ গয়না আমার—এ আমার রাণীর দেওয়া অর্ঘ্য।"

অমূল্য পাগলের মতো ব'লে উঠলো, "না, না, না, না,—কখনই না! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েচি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পার্‌বে না!"

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "ভাই তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইলো, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক্‌ না!"

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মতো সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে ব'ল্‌লে, "দেখুন্‌, সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করিনে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—"

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাস্‌বার চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লে, "অমূল্য, তোমারও এতোদিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয় করিনে। মক্ষিরাণী, এ গয়না আজ আমি নেবো ব'লে আসি নি—তোমাকে দেবো ব'লেই এসেছিলুম্‌। কিন্তু আমার জিনিষ তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ ক'র্‌বার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট ক'রে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার

এই জিনিষ তোমাকে আমি দান ক'র্‌চি—এই রইলো! এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করো, আমি চ'ল্‌লুম্‌। কিছুদিন থেকে তোমাদের দু'জনের মধ্যে বিশেষ কথা চ'ল্‌চে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘ'টে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পার্‌বে না। অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই প্রভৃতি যা কিছু আমার ঘরে ছিলো সমস্তই বাজারে তোমার বাসা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েচি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিষ রাখা চ'ল্‌বে না।"

এই ব'লে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চ'লে গেলো।

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি ক'র্‌তে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিলো না।"

কেন দিদি?

আমার ভয় হ'চ্ছিলো এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়ো—পাছে তোমাকে কেউ চোর ব'লে সন্দেহ ক'রে ধরে। আমার সে ছ'হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুন্‌তে হবে—এখনি তুমি বাড়ি যাও—যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটলি বের ক'রে ব'ল্‌লে, "দিদি, ছ' হাজার টাকা এনেচি।"

জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, "কোথায় পেলে?"

তার কোনো উত্তর না দিয়ে ব'ল্‌লে, "গিনির জন্য অনেক চেষ্টা ক'র্‌লুম্‌ সে হ'লো না, তাই নোট এনেচি।"

অমূল্য, মাথা খাও সত্যি ক'রে বলো, এ-টাকা কোথায় পেলে?

সে আপনাকে ব'ল্‌বো না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লুম্‌। ব'ল্‌লুম্‌—কি কাণ্ড ক'রেচো অমূল্য? এ টাকা কি—

অমূল্য ব'লে উঠ্‌লো, "আমি জানি তুমি ব'ল্‌বে এ টাকা আমি অন্যায় ক'রে এনেচি—আচ্ছা তাই স্বীকার। কিন্তু যতো বড়ো অন্যায় ততো বড়োই দাম, সে দাম আমি দিয়েচি। এখন এ-টাকা আমার।"

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুন্‌তে ইচ্ছে হ'লো না। শিরাগুলো সঙ্কুচিত হ'য়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আন্‌তে লাগ্‌লো। আমি ব'ল্‌লুম্‌, "নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেচো এখনি সেখানে দিয়ে এসো।"

সে বড়ো শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কি কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে! সন্দীপও তোমার যতো বড়ো অনিষ্ট ক'র্‌তে পারেনি আমি তাই ক'র্‌লুম্‌!

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মার্‌লে। সে ব'ল্‌লে, "সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম্‌ ব'লেই তো ওকে চিন্‌তে পেরেচি। জানো দিদি, তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে ছ'হাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করেনি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ

ক'রে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ ক'রে তুলে মুগ্ধ হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ব'ল্‌লে "এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য্য-পারিজাতের পাঁপ্‌ড়ি,—এ অলকা-পুরীর বাঁশি থেকে সুরের মতো ঝ'রে প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে শক্ত হ'য়ে উঠেচে, একে তো ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না, এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হ'য়ে থাক্‌বার কামনা ক'রেচে—ওরে অমূল্য, তোরা এ'কে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস্‌নে, এ হ'চ্চে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য—না, না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে প'ড়্‌বার জন্যে এর সৃষ্টি হয়নি। দেখো অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা ব'লেচে, পুলিশ সেই নৌকাচুরির কোনো খবর পায়নি—ও এই সুযোগে কিছু ক'রে নিতে চায়। দেখো অমূল্য, নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় ক'র্‌তে হবে।—আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, কেমন ক'রে?—সন্দীপ ব'ল্‌লে, "জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে!"—আমি ব'ল্‌লুম্‌, "রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।"—সন্দীপ ব'ল্‌লে, "আচ্ছা সে হবে।"—কেমন ক'রে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় ক'রে পুড়িয়ে ফেলেচি সে অনেক কথা।—সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে ব'লেচি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেবো—সন্দীপ ব'ল্‌লে, "এ কোন্‌ মোহ তোমাকে পেয়ে ব'স্‌লো! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা প'ড়্‌লো বুঝি! বলো 'বন্দেমাতরং'—ঘোর কেটে যাক্‌! তুমি তো জানো দিদি, সন্দীপ কি মন্ত্র জানে!

গিনি তারই কাছে রইলো। আমি অন্ধকার-রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপরে ব'সে 'বন্দেমাতরং' জপ্‌তে লাগ্‌লুম্। কাল যখন তুমি গয়না বেচ্‌তে দিলে তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম্। বেশ বুঝ্‌লুম্, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বল্‌চে। সে রাগ প্রকাশ ক'র্‌লে না ; ব'ল্‌লে, "দেখো যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে তো নিয়ে যাও।" ব'লে আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্, কোথায় রেখেচেন বলুন। সন্দীপ ব'ল্‌লে, আগে তোমার মোহ ভাঙ্‌বে তারপরে আমি ব'ল্‌বো। এখন নয়।—আমি দেখ্‌লুম্, কিছুতেই তাকে নড়াতে পার্‌বো না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হ'য়েছিলো। এর পরেও ওকে এই ছ'হাজার টাকার নোট দেখিয়ে সেই গিনি-ক'টা নেবার অনেক চেষ্টা ক'রেচি। গিনি এনে দিচ্চি ব'লে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেচে—এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আস্‌তে দিলে না! আবার বলে কি না—এ গয়না ওরি দান! আমাকে যে কতোখানি বঞ্চিত ক'রেচে সে আমি কাকে ব'ল্‌বো? এ আমি কখনো মাপ ক'র্‌তে পার্‌বো না।—দিদি ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েচো।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হ'য়েছে। কিন্তু, অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া

কাটালে হবে না, যে কালী মেখেছি সে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। দেরি ক'রোনা, অমূল্য, এখনি যাও এ টাকা যেখান থেকে এনেচ সেইখানেই রেখে এসো। পার্‌বে না, লক্ষী ভাই ?"

তোমার আশীর্ব্বাদে পার্‌বো দিদি।

এ শুধু তোমার এক্‌লার পারা নয়। এর মধ্যে যে আমারও পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম্ না, আমিই যেতুম্। আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি, যে, আমার পাপ তোমাকে সাম্‌লাতে হ'চ্চে।

ও-কথা ব'লোনা দিদি! যে রাস্তায় চ'লেছিলুম্ সে তোমার রাস্তা নয়। সে-রাস্তা দুর্গম ব'লেই আমার মনকে টেনেছিলো। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেচে—এ রাস্তা আমার আরও হাজার গুণে দুর্গম হোক্, কিন্তু তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে জিতে আস্‌বো—কোনো ভয় নেই! তাহ'লে এ টাকা যেখান থেকে এনেচি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে, এই তোমার হুকুম ?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানিনে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেচে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি তোমার কাছে আমার নিমন্ত্রন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় ক'রে তবে যাবো। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধ্যের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসবো।

হাস্‌তে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে প'ড়্‌লো—ব'ল্‌লুম্‌, "আচ্ছা!"

অমূল্য চ'লে যেতেই আমার বুক দমে গেলো। কোন্‌ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম্‌! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্ব্বনেশে ঘটা ক'রে কেন? এতো লোককে নিমন্ত্রণ? আমার একলায় কুললো না? এতো মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে? আহা ঐ ছেলেমানুষকে কেন মার্‌বে?

তাকে ফিরে ডাক্‌লুম্‌, অমূল্য!—আমার গলা এমন ক্ষীণ হ'য়ে বাজ্‌লো, সে শুনতে পেলে না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাক্‌লুম্‌, অমূল্য! তখন সে চ'লে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কি রাণী মা!

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে!

কি জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এলো। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ ব'ল্‌লে, "যখন তাড়িয়ে দিলে তখনি জান্‌তুম্‌ ফিরে ডাক্‌বে। যে-চাঁদের টানে ভাঁটা সেই-চাঁদের টানেই জোয়ার। এম্‌নি নিশ্চয় জান্‌তুম্‌ তুমি ডাক্‌বে, আমি যে দরজার কাছে অপেক্ষা ক'রে ব'সেছিলুম্‌। যেম্‌নি তোমার বেহারাকে দেখেচি অম্‌নি সে কিছু ব'ল্‌বার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লুম্‌—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্চি, এখনি যাচ্চি।—ভোজপুরীটা আশ্চর্য্য হ'য়ে হাঁ ক'রে রইলো। ভাব্‌লে

লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষিরাণী, সংসারে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দভেদী বাণ—আবার নিঃশব্দভেদী বাণও আছে! এতোদিন পরে এ লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেচে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে, রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখ্‌লুম্, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পার্‌লে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আন্‌লে। শিকার তো এসে প'ড়্‌লো। এখন একে নিয়ে কি ক'র্‌বে বলো? একেবারে নিঃশেষে মার্‌বে, না, তোমার খাঁচায় পূরে রাখ্‌বে? কিন্তু আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌চি, রাণী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বন্ধ করাও তেম্‌নি! অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা ক'র্‌তে বিলম্ব ক'রোনা।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেচে ব'লেই সে আজ এমন অনর্গল ব'কে গেলো। আমার বিশ্বাস, ও জান্‌তো আমি অমূল্যকেই ডেকেচি—বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম ব'লেছিলো ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হ'য়েচে। আমাকে ব'ল্‌তে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকিনি, অমূল্যকে ডেকেচি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে—এবার দুর্ব্বলকে দেখ্‌তে পেয়েচি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়্‌তে পার্‌বো না।

আমি ব'ল্‌লুম্ "সন্দীপবাবু, আপনি গলগল ক'রে এতো কথা ব'লে যান কেমন ক'রে? আগে থাক্‌তে বুঝি তৈরী হ'য়ে আসেন?"

একমুহূর্ত্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি ব'ল্‌লুম্‌, "শুনেচি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা-লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সেরকম খাতা আছে নাকি?"

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, "বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাব ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দরজির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর-বিধাতা কি আমাদেরই এম্‌নি নিরস্ত্র ক'রে রেখেচেন যে—

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন—এ-কথা-গুলো ঠিক হ'চ্চে না। দেখ্‌চি এক্‌-একবার আপনি উল্টো পাল্টা ব'লে বসেন—খাতা-মুখস্থর ঐ একটা মস্ত দোষ!"

সন্দীপ আর থাক্‌তে পার্‌লে না—একবারে গ'র্জ্জে উঠ্‌লো, তুমি! তুমি আমাকে অপমান ক'র্‌বে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা প'ড়েচে, বলো তো? তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরলো না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে-মুহূর্ত্তে খাটে না সে-মুহূর্ত্তেই ওর আর জোর নেই—রাজা থেকে একেবারে রাখাল হ'য়ে যায়! দুর্ব্বল! দুর্ব্বল! ও যতোই রূঢ় হ'য়ে উঠে কর্কশ কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌লো ততোই আনন্দে আমার বুক ভ'রে উঠ্‌লো। আমাকে বাঁধ্‌বার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে আমি মুক্তি পেয়েছি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে। অপমান করো, আমাকে অপমান করো, এইটেই তোমার সত্য; আমাকে স্তব ক'রো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্ত্তেই আপনাকে যেরকম সাম্‌লে নেয় আজ তার সে-শক্তি ছিলো না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। আগে হ'লে আমি এতে লজ্জা পেতুম্। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন না আমি আজ খুসি হ'লুম্। আমি ঐ দুর্ব্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দু'জনেই স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম্ দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত ক'রে চৌকিতে ব'স্‌লেন। ব'ল্‌লেন, "সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম্, শুন্‌লুম্ এই ঘরেই আছো।"

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে ব'ল্‌লে, "হাঁ, মক্ষিরাণী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। আমি যে মৌচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চ'লে আস্‌তে হ'লো!"

স্বামী ব'ল্‌লেন, "কাল ক'ল্‌কাতায় যাচ্চি তোমাকে যেতে হবে।"

সন্দীপ ব'ল্‌লে, "কেন বলো দেখি? আমি কি তোমার অনুচর না কি?"

আচ্ছা, তুমিই ক'ল্‌কাতায় চলো, আমিই তোমার অনুচর হবো।

ক'ল্‌কাতায় আমার কাজ নেই।

সেই জন্যেই তো ক'ল্‌কাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি তো ন'ড়চি নে।

তাহ'লে তোমাকে নাড়াতে হবে।

জোর?

হাঁ জোর।

আচ্ছা বেশ—ন'ড়্বো। কিন্তু জগৎটা তো ক'ল্কাতা আর তোমার এলাকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরও জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হ'য়েছিলো জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে ব'ল্লে,—"মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতোটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ ক'রে দেখেচি—সেই জন্যেই এখান থেকে নড়িনে। মক্ষিরাণী, আমার কথা এরা কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না—হয়তো তুমিও বুঝ্‌বে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা ক'র্‌তে চ'ল্লুম্। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হ'য়ে গেছে। 'বন্দে-মাতরং' নয়—বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের রক্ষা করেন—প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন—বড়ো সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণ-নৃত্যের নূপুর-ঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেচো আমার হৃদ্‌পিণ্ডে! এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলা দেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্ত্তে ব'দ্‌লে দিয়েচো—দয়ামায়া তোমার নেই গো—এসেচো মোহিনী, তুমি তোমার বিষপাত্র নিয়ে—সেই

বিষ পান ক'রে সেই বিষে জর্জ্জর হ'য়ে, হয় ম'র্‌বো, নয় মৃত্যুঞ্জয় হবো! মাতার দিন আজ নেই—প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া, দেবতা স্বর্গ ধর্ম্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ ক'রে দিয়েচো, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন! প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া, তুমি যে-দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছো তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য ক'র্‌তে পারি! এরা ভালো মানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো —এরা সবার ভালো ক'র্‌তে চায়—যেন সবই সত্য। কখনই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে—তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর ক'রেচে, তোমার পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েচে,—আমি ভালো নই, আমি ধার্ম্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানিনে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে পেরেচি কেবলমাত্র তাকেই মানি!

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এই কিছু-আগেই আমি এ'কে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা ক'রেছিলুম্! যাকে ছাই ব'লে দেখেছিলুম্ তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেচে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন ক'রে মিশিয়ে কেন্ মানুষকে তৈরি করেন? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে? আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাব্‌ছিলুম্ এই মানুষটাকে

একদিন রাজা ব'লে ভ্রম হ'য়েছিলো বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা,—তা নয় তা নয়—যাত্রার দলের পোষাকের মধ্যেও এক এক সময় রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা, কিন্তু তবুও—আমরা জানিনে, আমরা শেষ কথাটাকে জানিনে, এইটেই স্বীকার করা ভালো, আপনাকেও জানিনে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য্য—তাকে নিয়ে কি প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হ'চ্চে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন—মাঝের থেকে দগ্ধ হ'য়ে গেলুম্! প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন ক'রবেন।

কিছুদিন থেকে বারেবারে মনে হ'চ্চে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝ্‌তে পারচে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ঙ্কর—আর-এক বুদ্ধি ব'ল্‌চে এই তো মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন চারিদিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়—সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্ত্তি—ভয় ধ'র্‌বার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে—সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্ব্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ্ ক'রে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হ'য়ে ও এসেচে—অশিব মন্ত্র প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে রাস্তা দিয়ে চ'লেচে, আর ছুটে আস্‌চে দেশের সব বালকরা—সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা ব'সে আছেন

তিনি কেঁদে উঠেচেন—তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পান-সভা বসিয়েছে—ধূলার উপর ঢেলে ফেল্‌তে চায় সব সুধা, চুরমার ক'র্‌তে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র! সবই বুঝ্‌লুম্‌ কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারিনে! সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা ক'র্‌বার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ—মাৎলামি স্বর্গের সাজ প'রে এসে তাপসদের সাম্‌নে নৃত্য ক'র্‌তে থাকে—বলে, "তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর—তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েচেন—আমি তোমাদের বরণ ক'র্‌বো,—আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।"

একটুখানি চুপ্‌ ক'রে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে ব'ল্‌লে, "এবার দূরে যাবার সময় এসেচে দেবী! ভালোই হ'য়েচে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হ'য়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তাহ'লে একে-একে আবার সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে প'ড়ে সস্তা ক'র্‌তে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে—মুহূর্ত্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'র্‌তে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট ক'র্‌তে ব'সেছিলুম্‌—ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হ'লো, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা ক'র্‌লে, আর তোমার এই পূজারিকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠ্‌লো। দেবী, আমিও

আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম্—আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধ'র্‌ছিলো না,—এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙ্‌বে-ভাঙ্‌বে ক'র্‌ছিলো—আজ তোমার বড়ো মূর্ত্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা ক'র্‌তে চ'ল্‌লুম্—তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য ক'রে পাবো—এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম্, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাবো!"

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিলো। আমি সেটা তুলে ধ'রে ব'ল্‌লুম্, "আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম্, তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।"

আমার স্বামী চুপ্ ক'রে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চ'লে গেলো।

বিমলার আত্মকথা

অমূল্যের জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরী ক'র্‌তে ব'সেছিলুম্ এমন সময় মেজোরাণী এসে ব'ল্‌লেন, "কিলো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকেই খাওয়াবার উজ্জুগ হ'চ্চে বুঝি?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই না কি?"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "আজ তো তোর খাওয়াবার কথা নয় আমরা খাওয়াবো। সেই জোগাড়ও তো ক'র্‌ছিলুম্, এমন সময় খবর শুনে পিলে চ'ম্‌কে গেছে—আমাদের কোন্ কাছারিতে না কি পাঁচ-ছশো ডাকাত প'ড়ে ছ'হাজার টাকা লুটে নিয়েচে। লোকে ব'ল্‌চে এইবার তা'রা আমাদের বাড়ি লুট্ ক'র্‌তে আস্‌বে।"

এই খবর শুনে আমার মনটা হাল্কা হ'লো। এ তবে আমাদেরি টাকা! এখনি অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ'হাজার টাকা এইখানেই আমার সাম্‌নে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক্ তার পরে আমার যা ব'ল্‌বার সে আমি তাঁকে ব'ল্‌বো!

মেজোরাণী আমার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে ব'ল্‌লেন, "অবাক্ ক'র্‌লে! তোর মনে একটুও ভয় ডর নেই?"

আমি ব'ল্লুম্, "আমাদের বাড়ি লুট্ ক'র্তে আস্বে এ আমি বিশ্বাস ক'র্তে পারি নে!"

বিশ্বাস ক'র্তে পারো না! কাছারি লুট্ ক'র্বে এইটেই বা বিশ্বাস ক'র্তে কে পার্তো।

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নীচু ক'রে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পূর দিতে লাগ্লুম্। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তিনি ব'ল্লেন, "যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ'হাজার টাকাটা এখনি বের ক'রে নিয়ে ক'ল্কাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।"

এই ব'লে তিনি চ'লে যেতেই আমি পিঠের বারকোস সেইখানে আল্গা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্ধুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম্। আমার স্বামীর এম্নি ভোলা-মন যে দেখি তাঁর যে-জামার পকেটে চাবি থাকে সে-জামাটা তখনো আল্নায় ঝুল্চে! চাবির রিং থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফে'ল্লুম্।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা প'ড়্লো! ব'ল্লুম্, "কাপড় ছাড়্চি!"—শুন্তে পেলুম্, মেজোরাণী ব'ল্লেন, "এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি ক'র্চে, আবার এখনি সাজ্ ক'র্বার ধুম প'ড়ে গেলো! কতো লীলাই দেখ্বো! আজ বুঝি ওদের "বন্দেমাতরমে'র বৈঠক ব'স্বে। ওলো, ও দেবীচৌধুরাণী, লুঠের মাল বোঝাই হ'চ্চে না কি?"

কি মনে ক'রে একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্ধুকটা খুল্‌লুম্‌। বোধ হয় মনে ভাব্‌ছিলুম্‌, যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়;—যদি হঠাৎ সেই ছোটো দেরাজটা টেনে খুল্‌তেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেম্‌নিই সাজানো র'য়েচে! হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য!

মিছামিছি কাপড় ছাড়্‌তেই হ'লো। কোনো দরকার নেই তবু নতুন ক'রে চুল বাঁধ্‌লুম্‌। মেজোরাণীর সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, বলি এতো সাজ কিসের?—আমি ব'ল্‌লুম্‌, "জন্মতিথির।"

মেজোরাণী হেসে ব'ল্‌লেন, "একটা কিছু ছুতো পেলেই অম্‌নি সাজ! ঢের দেখেচি তোর মতো এমন ভাব্‌নে দেখি নি!"

অমূল্যকে ডাক্‌বার জন্যে বেহারার খোঁজ ক'র্‌চি এমন সময় সে এসে পেন্সিলে লেখা একটি ছোটো চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখেচে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে কিন্তু সবুর ক'র্‌তে পার্‌লুম্‌ না। আগে তোমার আদেশ পালন ক'রে আসি তার পরে প্রসাদ গ্রহণ ক'র্‌বো। হয় তো ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কা'র হাতে টাকা ফেরাতে চ'ল্‌লো, আবার কোন্‌ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেলো! আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়্‌তেই পারি কিন্তু লক্ষ্য ভুল হ'লে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনি

স্বীকার করা আমার উচিত ছিলো। কিন্তু মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিঁকে থাকা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যা আমরা ভাঙ্‌বো ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে—সেই ভাঙা জিনিষের খোঁচা ন'ড়্‌তে-চ'ড়্‌তে আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তেই বাজ্‌তে থাক্‌বে। অপরাধ করা শক্ত নয় কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যতো কঠিন এমন আর কারো নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথা-বার্ত্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হ'য়ে গেছে। তাই হঠাৎ এতো বড়ো একটা কথা কেমন ক'রে এবং কখন যে তাঁকে ব'ল্‌বো তা কিছুতেই ভেবে পেলুম্ না। আজ তিনি অনেক দেরীতে খেতে এসেচেন—তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হ'য়ে কিছুই প্রায় খেতে পার্‌লেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ ক'রে খেতে ব'ল্‌বো সে অধিকারটুকু খুইয়েচি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছ্‌লুম্।

একবার ভাব্‌লুম্ সঙ্কোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম করো'সে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্চে!—একটু কেশে কথাটা যেই তুল্‌তে যাচ্চি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে দারোগাবাবু কাসেম সর্দ্দারকে নিয়ে এসেচে। আমার স্বামী উদ্বিগ্ন মুখে তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজোরাণী এসে

ব'ল্‌লেন, "ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলিনে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম্‌,—এরি মধ্যে কখন্‌—"

কেন, কি চাই!

শুন্‌চি তোরা কাল ক'ল্‌কাতায় যাচ্চিস্‌। তাহ'লে আমি এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না। বড়োরাণী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও ন'ড়্‌বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগ্‌লে ব'সে কথায়-কথায় চ'ম্‌কে-চ'ম্‌কে ম'র্‌বো সে আমি পার্‌বো না। কাল যাওয়াই তো ঠিক?

আমি ব'ল্‌লুম্‌, "হাঁ ঠিক।"—মনে মনে ভাব্‌লুম্‌, সেই যাওয়ার আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কতো ইতিহাসই যে তৈরি হ'য়ে উঠ্‌বে তার ঠিকানা নেই। তার পরে ক'ল্‌কাতাতেই যাই, কি এখানেই থাকি সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কি, কে জানে! সব ধোঁয়া, স্বপ্ন!

এই যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো ব'লে, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছে—এই সময়টাকে কেউ একদিন থেকে আরেক দিন পর্য্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ ক'রে দিতে পারে না? তাহ'লে এরি মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই—অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত ক'রে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ

অনেক সময় নেয়—সে এতো সময় যে, মনে হয় ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই—কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতোটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে ওঠে, তখন তা'কে কোনো-মতে আঁচল দিয়ে বুক দিয়ে প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে ক'র্‌চি ভাব্‌বো না, অসাড় হ'য়ে চুপ্‌ ক'রে প'ড়ে থাক্‌বো, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক্‌গে! পর্শু দিনের মধ্যেই তো যা হবার তা হ'য়ে যাবে—জানাশুনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন, প্রশ্নের জবাব, সবই!

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের-দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুল্‌তে পার্‌চি নে। সে তো চুপ্‌ ক'রে ব'সে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি—সে যে ছুটে গেলো বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি, সে আমার বালক দেবতা,—সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে;—সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইবো কেমন ক'রে? বাছা আমার তোমাকে প্রণাম, ভাই আমার তোমাকে প্রণাম—নির্ম্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম—জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হ'য়ে আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চারদিকে নানা গুজব জেগে উঠ্‌চে, পুলিস আনাগোনা ক'র্‌চে, বাড়ির দাসী চাকররা সবাই উদ্বিগ্ন।

ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে ব'ল্‌লে,"ছোটোরাণীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দাও।"—ঘরের ছোটোরাণীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি ক'রে নিজে তার মধ্যে আট্‌কা প'ড়ে গেছে একথা বলি কার কাছে? ক্ষেমার গয়না থাকোর জমানো টাকা আমাকে ভালোমানুষের মতো নিতে হ'লো! আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সোয় ক'রে একটি বেনারসী কাপড় এবং তার আর-আর দামী সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেলো —ব'ল্‌লে, "রাণীমা এই বেনারসী কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম্।"

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্দুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী—থাক্, সে কথা কল্পনা ক'রে হবে কি! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেস্‌রা মাঘের দিন এসেছে। সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এম্‌নি কাটাই থেকে যাবে? অমূল্য লিখেচে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফির্‌বে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা ব'সে চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি ক'র্‌তে গেলুম্। যা তৈরি হ'য়েচে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো ক'র্‌তে হবে। এতো কে খাবে? বাড়ির সমস্ত দাসী চাকরদের খাইয়ে দেবো। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্য্যন্ত আমার দিনের সীমা। কাল্‌কের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পর পিঠে ভাজ্‌চি, বিশ্রাম নেই। এক্-এক বার মনে হ'চ্চে যেন উপরে আমার মহলের দিকে' কি-একটা গোলমাল চ'ল্‌চে। হয় তো আমার স্বামী লোহার সিন্দুক খুল্‌তে এসে চাবি খুঁজে পাচ্চেন না। তাই নিয়ে মেজোরাণী দাসী চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েচেন। না, আমি শুনবো না—কিচ্ছু শুনবো না, দরজা বন্ধ ক'রে থাক্‌বো। দরজা বন্ধ ক'র্‌তে যাচ্চি এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আস্‌চে—সে হাঁপিয়ে ব'ল্‌লে ছোটোরাণীমা! আমি ব'লে উঠ্‌লুম্, "যা, যা, বিরক্ত করিস্ নে, আমার এখন সময় নেই।"—থাকো ব'ল্‌লে, "মেজোরাণীমার বোনপো নন্দবাবু ক'ল্‌কাতা থেকে এক কল এনেচেন সে মানুষের মতো গান করে, তাই মেজোরাণীমা তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েচেন।"

হাস্‌বো কি কাঁদ্‌বো তাই ভাবি! এর মাঝখানেও গ্রামোফোন্! তাতে যতোবার দম দিচ্চে সেই থিয়েটারের নাকীসুর বেরোচ্চে—ওর কোনো ভাবনা নেই! যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এম্‌নি বিষম বিদ্রূপ হ'য়েই ওঠে!

সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে দেরি ক'র্‌বে না—তবু থাক্‌তে পার্‌লুম্ না—বেহারাকে ডেকে ব'ল্‌লুম্, "অমূল্যবাবুকে খবর দাও।"—বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে ব'ল্‌লে, "অমূল্যবাবু নেই।"

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় ক'রে উঠ্‌লো। অমূল্যবাবু নেই—সেই

সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মতো বাজ্‌লো। নেই, সে নেই! সে সূর্য্যাস্তের সোনার রেখাটির মতো দেখা দিলে—তার পরে আর সে নেই! সম্ভব অসম্ভব কতো দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জ'মে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাক্‌বো কেমন ক'রে?

অমূল্যর কোন চিহ্নই আমার কাছে ছিলো না—কেবল ছিলো তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী—সেই পিস্তলটি। মনে হ'ল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত র'য়েচে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেচে, বালক-বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন। কি ভালোবাসার দান! কি পাবন-মন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের ক'রে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম্। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ঠাকুর-বাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। আমি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌লুম্।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেলো। মেজোরাণী এসে ব'ল্‌লেন, "নিজে নিজেই খুব ধুম ক'রে জন্মতিথি ক'রে নিলি যাহোক'। আমাদের বুঝি কিছু ক'র্‌তে দিবি নে?"—এই ব'লে তিনি তাঁর সেই গ্রামোফোন্‌টাতে যতো রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরৎ শোনাতে

লাগ্‌লেন ; মনে হ'তে লাগ্‌লো যেন গন্ধর্ব্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠ্‌চে।

খাওয়ানো শেষ ক'র্‌তে অনেক রাত হ'য়ে গেলো। ইচ্ছা ছিলো আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধূলো নেবো। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমোচ্চেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘুরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েচে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখ্‌লুম্‌। চুলের স্পর্শ লাগ্‌তেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে ব'স্‌লুম্‌। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে—তার সমস্ত পাতা ঝ'রে গিয়েছে—তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেলো।

আমার হঠাৎ মনে হ'লো আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় ক'র্‌চে—রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইচে। কেননা আমি যে একলা! একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয় স্বজন একে একে ম'রে গিয়েচে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই র'য়েচে তবু কাছে নেই, যে-মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকেই একেবারে খ'সে প'ড়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে

চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে র'য়েছি সেইখানেই নেই—যারা আমাকে ঘিরে র'য়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চ'ল্‌চি ফির্‌চি বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে—যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো।

কিন্তু মানুষ যখন ব'দ্‌লে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখ্‌তে পাই যা ছিলো তা সবই আছে কেবল ন'ড়ে-চ'ড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিলো আজ তা এলোমেলো,—যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিলো আজ তা ধূলোয়। সেই জন্যই তো বুক ফেটে যাচ্চে। ইচ্ছা করে মরি, কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে—মরার ভিতরে তো শেষ দেখ্‌তে পাচ্চি নে। আমার মনে হ'চ্চে যেন মরার মধ্যে আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি—অন্য উপায় নেই।

এবারকার মতো একবার আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু! যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন ব'লে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা ক'রে তুলেছি। আজ তা আর বহনও ক'র্‌তে পার্‌চিনে ত্যাগ ক'র্‌তেও পার্‌চিনে। আর-একদিন তুমি আমার ভোর-বেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশী বাজিয়েছিলে সেই বাঁশীটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হ'য়ে যাক্‌—তোমার সেই বাঁশীর সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়্‌তে পারে

না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র ক'র্‌তে পারে না। সেই বাঁশীর সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন ক'রে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম্‌—একটা কোনো-দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো-আশ্রয়, একটু-ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে, সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে ব'ল্‌লুম্‌, আমি দিনরাত ধর্ন্না দিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো প্রভু—আমি খাবো না, আমি জল স্পর্শ ক'র্‌বো না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছয়!

এমন সময় পায়ের শব্দ শুন্‌লুম্‌। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠ্‌লো। কে বলে দেবতা দেখা দেন না! আমি মুখ তুলে চাইলুম্‌ না পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। এসো, এসো, এসো,—তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক্‌, আমার এই বুকের কাঁপনের উপরে এসে দাঁড়াও, প্রভু, আমি এই মুহূর্ত্তেই মরি!

আমার শিয়রের কাছে এসে ব'স্‌লেন। কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন ন'ড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পার্‌লেন না। মনে হ'লো মূর্চ্ছা যাবো। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে প'ড়্‌লো। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধ'র্‌লুম্‌—ঐ পায়ের চিহ্ণ চিরজীবনের মতো ঐখানে আঁকা হ'য়ে যায় না কি?

এইবার তো সব কথা খুলে ব'ল্‌লেই হ'তো ! কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে ? থাক্‌গে আমার কথা !

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। কাল যে-অপমান আমার জন্যে আস্‌চে সেই অপমানের ডালি সকলের সাম্‌নে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌তে পার্‌বো।

কিন্তু এই মনে ক'রে আমার বুক ভেঙে যাচ্চে, আজ ন'বছর আগে যে-নহবৎ বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনো-দিন বাজ্‌বে না। এ ঘরে আমাকে বরণ ক'রে এনেছিলো যে ! ওগো, এই জগতে কোন দেবতার পায়ে মাথা কুটে ম'র্‌লে সেই বউ চন্দন চেলি প'রে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে ? কতো দিন লাগ্‌বে আর—কতো যুগ, কতো যুগান্তর—সেই ন'বছর আগেকার দিনটিতে আর একটিবার ফিরে যেতে ? দেবতা নতুন সৃষ্টি ক'র্‌তে পারেন কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গ'ড়্‌তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে ?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা ক'ল্‌কাতায় যাবো। সুখ দুঃখ কেবলি জমিয়ে তুল্‌তে থাক্‌লে বোঝা ভারি হ'য়ে ওঠে। কেননা ব'সে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্ত্তা এটা বানানো জিনিষ—সত্য এই যে আমি জীবনপথের পথিক। ঘরের কর্ত্তাকে তাই বারেবারে ঘা লাগ্‌বে—তারপরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে—যতদূর পর্য্যন্ত একপথে চলা গেল ততদূর পর্য্যন্তই ভালো—তার চেয়ে বেশি টানাটানি ক'র্‌তে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে বাঁধন আজ রইলো প'ড়ে—এবার বেরিয়ে প'ড়্‌লুম্—চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যেটুকু চোখে-চোখে মেলে, হাতে-হাতে ঠেকে সেই-টুকুই ভালো। তারপরে? তারপরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ,—তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা ক'র্‌তে পারো, প্রিয়ে? সাম্‌নে যে বাঁশী বাজ্‌চে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুন্‌তে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্য্যের ঝরণা ঝ'রে প'ড়্‌চে। লক্ষ্মীর অমৃত ভাণ্ডার ফুরোবে না ব'লেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র, ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাবো না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সাম্‌নে চ'লে যাবো।

মেজোরাণীদিদি এসে ব'ল্‌লেন, "ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভ'রে গোরুর গাড়ি বোঝাই ক'রে যে চ'ল্‌লো তার মানে কি বলো তো।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারিনি।"

মায়া কিছু কিছু থাক্‌লেই যে বাঁচি। কিন্তু এখানে আর ফির্‌বে না কি?

আনাগোনা চ'ল্‌বে কিন্তু প'ড়ে থাকা আর চ'ল্‌বে না।

সত্যি না কি? তাহ'লে একবার এসো, একবার দেখ'সে কতো জিনিসের উপরে আমার মায়া।—এই ব'লে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটোবড়ো নানা রকমের বাক্স আর পুঁটলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখো ঠাকুরপো, আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুঁড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি—এই সব দেখ্‌চো এক-এক টিন মসলা। এই দেখো তাস, দশপঁচিশও ভুলিনি, তোমাদের না পাই আমি খেল্‌বার লোক জুটিয়ে নেবোই। এই চিরুণী তোমারই স্বদেশী চিরুণী, আর এই—

কিন্তু ব্যাপারটা কি মেজোরাণী? এ সব বাক্সয় তুলেচো কেন?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে ক'ল্‌কাতায় যাচ্ছি।

সে কি কথা?

ভয় নেই, ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব ক'র্‌তে

যাবো না, ছোটোরাণীর সঙ্গেও ঝগ্‌ড়া ক'র্‌বো না। ম'র্‌তেই তো হবে তাই সময় থাক্‌তে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো—ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হ'লে আমার ম'র্‌তে ঘেন্না ধরে,—সেই জন্যেই তো এতোদিন ধ'রে তোমাদের জ্বালাচ্চি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌লো। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন'বছর বয়সে মেজোরাণী আমাদের এই বাড়িতে এসেচেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুর-বেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় ব'সে ওঁর সঙ্গে খেলা ক'রেচি। বাগানে আমড়াগাছে চ'ড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেচি তিনি নীচে ব'সে সেগুলি কুচি-কুচি ক'রে তা'র সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি ক'রেচেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষ্যে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিলো, তার ভার ছিলো আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিলো না। তার পরে যে-সব সৌখীন জিনিষের জন্যে দাদার পরে তাঁর আব্‌দার ছিলো সে-আবদারের বাহক ছিলুম্‌ আমি,—আমি দাদাকে বিরক্ত ক'রে ক'রে যেমন ক'রে হোক্‌ কাজ উদ্ধার ক'রে আন্‌তুম্‌। তারপরে মনে পড়ে, তখ্‌নকার দিনে জ্বর হ'লে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিলো—মেজোরাণী আমার দুঃখ সইতে পার্‌তেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে দিয়েচেন;

এক-একদিন ধরা প'ড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সইতে হ'য়েচে। তার পরে বড়-হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হ'য়ে উঠেছে—কতো ঝগ্‌ড়াও হ'য়েচে, বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষ্যা, সন্দেহ এবং বিরোধও এসে প'ড়েচে, আবার তার মাঝখানে বিমল এসে প'ড়ে কখনো কখনো এমন হ'য়েচে, যে, মনে হ'য়েচে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়্‌বে না—কিন্তু তার পরে প্রমাণ হ'য়েচে অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে প্রবল। এম্‌নি ক'রে শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখা-প্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার ক'রে দাঁড়িয়েচে।—যখন দেখ্‌লুম্‌ মেজোরাণী তাঁর সমস্ত ছোটো-খাটো জিনিষপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই ক'রে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ ক'রে দাঁড়িয়েছেন তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠ্‌লো। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম্‌ কেন মেজোরাণী, যিনি ন'বছর বয়স থেকে আর এপর্য্যন্ত কখনও একদিনের জন্যও এ-বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তাঁর সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চ'ল্‌লেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে ব'ল্‌তেই চান না—অন্য কতো রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্ত্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র

সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন ক'রেচেন, তার বেদনা যে কতো গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যতো স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌লুম্ এমন আর কোনো দিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি টাকা কড়ি ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে ছোটোখাটো সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে বারবার ঝগ্‌ড়া হ'য়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়, তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবী তিনি প্রবল ক'র্‌তে পারেন নি—বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে একে ম্লান ক'রে দিয়েচে,—এইখানে তিনি ন'ড়্‌তে চ'ড়্‌তে ঘা পেয়েচেন অথচ তাঁর নালিশ ক'র্‌বার জোর ছিলো না। বিমলও একরকম ক'রে বুঝেছিল আমার উপর মেজোরাণীর দাবী কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবী নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর,—সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির পরে তার এতোটা ঈর্ষ্যা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ ক'রে ঘা দিতে লাগ্‌লো। একটা তোরঙ্গের উপর ব'সে প'ড়্‌লুম্—ব'ল্‌লুম্, "মেজোরাণীদিদি, আমরা দু'জনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েচি সেই দিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।"

মেজোরাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লেন, "না ভাই, মেয়ে জন্ম নিয়ে আর নয়—যা স'য়েচি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক্, ফের তার কি সয়?"

আমি ব'লে উঠ্‌লুম্, "দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।"

তিনি ব'ল্‌লেন, "তা হ'তে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধ্‌তে চাই, বাঁধা প'ড়্‌তে চাই,—আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা যদি মেল্‌তে চাও আমাদের সুদ্ধু নিতে হবে—ফেল্‌তে পার্‌বে না। সেই জন্যেই তো এই সব বোঝা সাজিয়ে রেখেচি—তোমাদের একেবারে হাল্কা হ'তে দিলে কি আর রক্ষা আছে!"

আমি হেসে ব'ল্‌লুম্, "তাই তো দেখ্‌চি—বোঝা ব'লে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও ব'লেই আমরা নালিশ করি নে।"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "আমাদের বোঝা হ'চ্চে ছোটো জিনিষের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই ব'ল্‌বে আমি সামান্য আমার ভার কতটুকুইবা,—এম্‌নি ক'রে হাল্কা জিনিষ দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি। কখন্ বেরোতে হবে ঠাকুরপো?"

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়—সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখো ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে—আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়ো—গাড়িতে রাত্তিরে তো ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হ'য়েচে দেখ্‌লেই মনে হয় আর-একটু

হ'লেই ভেঙে প'ড়্বে। চলো, এখনি তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোম্‌টা টেনে মৃদুস্বরে ব'ল্‌লে "দারোগা-বাবু কাকে সঙ্গে ক'রে এনেচে, মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়।"

মেজোরাণী রাগ ক'রে উঠে ব'ল্‌লেন, "মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই র'য়েচে! ব'লে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।"

আমি ব'ললুম্ "একবার দেখে আসিগে—হয় তো কোনো জরুরি কাজ আছে।"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন "না সে হবে না। ছোটোরাণী কাল বিস্তর পিঠে তৈরী ক'রেচে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে রাখ্‌চি।"—ব'লে তিনি আমাকে হাতে ধ'রে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে ব'ল্‌লুম্, "আমার সাফ কাপড় যে এখনো—।" তিনি ব'ল্‌লেন, "সে আমি ঠিক ক'রে রাখ্‌বো; ততক্ষণ তুমি স্নান ক'রে নাও।"

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই—সংসারে এ যে বড়ো দুর্লভ। থাক্‌গে, দারোগাবাবু ব'সে ব'সে পিঠে খাক্‌গে! না-হয় হ'লো আমার কাজের অবহেলা!

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারগা দুপাঁচ জনকে

ধরা-পাক্‌ড়া ক'রচেই। রোজই একটা-না-একটা নিরীহ লোককে ধ'রে বেঁধে এনে আসর গরম ক'রে রেখেছে। আজও বোধ হয় তেম্‌নি কোন্ এক অভাগাকে পাক্‌ড়া ক'রে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে তো ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম্। মেজোরাণী বাইরে থেকে ব'ল্‌লেন, "জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে বুঝি?"

আমি ব'ল্‌লুম্, "পিঠে দু'জনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ো—দারোগা যাকে চোর ব'লে ধ'রেচে, পিঠে তারই প্রাপ্য—বেহারাকে ব'লে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।"

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম্। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল ব'সে। এ কি আমার সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিণী? কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতে ব'সে থাকে? আমি একটু থম্‌কে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নীচু ক'রে আমাকে ব'ল্‌লে, "তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

আমি ব'ল্‌লুম্, "তা'হ'লে এসো আমাদের ঘরে।"

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্চো?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ,—আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এসো—তারপরে তোমার খাওয়া হ'লে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য। সে যাকে ধ'রে এনেচে সে তখনো ব'সে ব'সে পিঠে খাচ্চে।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লুম্‌, "এ কি অমূল্য যে!"

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে ব'ল্‌লে, "আজ্ঞে হাঁ,—পেট ভ'রে খেয়ে নিয়েচি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তা হ'লে যে-ক'টা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।"—ব'লে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লুম্‌, "ব্যাপারখানা কি?"

দারোগা হেসে ব'ল্‌লে, "মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই র'য়ে গেছে তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্চি।"

এই ব'লে একটা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলি খুলে একতাড়া নোট সে আমার সাম্‌নে ধ'রলে। ব'ল্‌লে, "এই মহারাজের ছ'হাজার টাকা।"

কোথা থেকে বেরোলো?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কাল রাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে ব'ল্‌লেন, "চোরাই নোট পাওয়া গেছে।"—চুরি যেতে নায়েব এতো ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হ'লো সবাই সন্দেহ ক'রবে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিলো। এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেচে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল ক'রে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েচে। আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে

গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে প'ড়েচি।" উনি ব'ল্‌লেন, "কোথা থেকে পেয়েচি সে আপনাকে ব'ল্‌বো না।" আমি ব'ল্‌লুম্, "না ব'ল্‌লে আপনি তো ছাড়া পাবেন না।" উনি বলেন, "মিথ্যে ব'ল্‌বো।" আমি বলি, "আচ্ছা তাই বলুন।" উনি বলেন, "ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েচি।" আমি ব'ল্‌লুম্, "মিথ্যে কথা অতো সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কি দরকারে গিয়েছিলেন সমস্ত বলা চাই।" উনি ব'ল্‌লেন, "সে সমস্ত বানিয়ে তোল্‌বার আমি যথেষ্ট সময় পাবো—সে জন্যে কিছু চিন্তা ক'র্‌বেন না।"

আমি ব'ল্‌লুম্ "হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছি-মিছি টানাটানি ক'রে কি হবে?"

দারোগা ব'ল্‌লেন, "শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে—তিনি আমার ক্লাস্-ফ্রেণ্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে ব'লে দিচ্চি—ব্যাপারখানা কি? অমূল্য জান্‌তে পেরেচেন কে চুরি ক'রেচে—এই 'বন্দে-মাতরমে'র হুজুক উপলক্ষ্যে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই সব হ'চ্চে ওঁর বীরত্ব। বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মতো ঐ আঠারো উনিশ ছিলো—প'ড়্‌তুম্ রিপন কলেজে—একদিন ষ্ট্র্যাণ্ডে একটা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারা-ওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম্—দৈবাৎ ফ'স্‌কে গেছে।—মহারাজ

এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হ'ল কিন্তু আমি ব'লে রাখ্‌ছি কে এর মূলে আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, "কে?"

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দ্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চ'লে গেলেন আমি অমূল্যকে ব'ল্‌লুম, "টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বলো কারো কোনো ক্ষতি হবে না।"

সে ব'ল্‌লে, "আমি"।

"কেমন ক'রে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

আমি একলা।

অমূল্য যা ব'ল্‌লে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বাইরে ব'সে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিলো অন্ধকার। অমূল্যর দুইপকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিলো কালো মুখোষ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্-আই লণ্ঠনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ ক'রতেই সে হাঁউমাউ শব্দ ক'রে মূর্চ্ছা গেলো—দু'চারজন বর্কন্দাজ ছুটে আস্‌তেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ ক'রে দিলে, তারা যে-যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। কাসেম সর্দ্দার লাঠি হাতে ছুটে এলো, তার পা লক্ষ্য ক'রে গুলি মারতেই সে ব'সে প'ড়্‌লো। তারপরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্দুক খুলিয়ে ছ'হাজার টাকার নোটগুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া সাইস

পাঁচ ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পরদিন-সকালে আমার এখানে এসে পৌঁছেচে।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌, অমূল্য, "এ কাজ কেন ক'র্‌তে গেলে?"

সে ব'ল্‌লে, "আমার বিশেষ দরকার ছিলো।"

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম্‌ তাঁকে ডাকুন, তাঁর সাম্‌নে আমি ব'ল্‌বো।

তিনি কে?

ছোটো-রাণীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম্‌। তিনি একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লেন—পায়ে জুতোও ছিলো না। দেখে আমার মনে হ'লো বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি—সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেচে।

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, "তোমার আদেশ পালন ক'রে এসেচি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েচি।"

বিমল ব'ল্‌লে, "বাঁচিয়েচো ভাই।"

অমূল্য ব'ল্‌লে, "তোমাকে স্মরণ ক'রেই একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। আমার 'বন্দেমাতরং' মন্ত্র রইল তোমার

পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েচি।”

বিমলা এ কথাটা ঠিক্ বুঝতে পার্‌লে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের ক’রে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। ব’ল্‌লে,“সব খাই নি, কিছু রেখেচি—তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে ব’লে এইগুলি জমানো আছে।”

আমি বুঝ্‌লুম্, এখানে আমার আর দরকার নেই; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম্। মনে ভাবলুম্, আমি তো কেবল ব’কে ব’কেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারিনে—যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার, আমরা নিবোনো, আমরা দীপ জ্বালাতে পার্‌বো না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হ’লো, আমার সাজানো বাতি জ্ব’ল্‌লো না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম্। বোধ হয় আর-একবার মেজোরাণীর ঘরের দিকে আমার মন্‌টা ছুট্‌লো। আমার জীবনও এ-সংসারে কোনো একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েচে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড়ো দরকার;—নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না—বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ ক’রতে হয়।

মেজোরাণীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে ব'ললেন, "এই যে, ঠাকুরপো, আমি বলি, বুঝি তোমার আজও দেরী হয়। আর দেরী নেই, তোমার খাবার তৈরী হ'য়েচে এখনি আস্‌চে।"

আমি ব'ললুম, "ততক্ষণ সেই টাকাটা বের ক'রে ঠিক্ ক'রে রাখি।"

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজোরাণী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "দারোগা যে এলো, সেই চুরির কোনো আস্কারা হ'লো না কি?"

সেই ছ-হাজার টাকা ফিরে পাবার বার্তাটা মেজোরাণীর কাছে আমার ব'ল্‌তে ইচ্ছা হ'লো না। আমি ব'ললুম্, "সেই নিয়েই তো চ'ল্‌চে।"

লোহার সিন্ধুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের ক'রে দেখি সিন্ধুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতোবার কতো বাক্স খুলেচি আলমারি খুলেচি কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে সে চাবিটা নেই।

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "চাবি কই?"

আমি তার জবাব না ক'রে বৃথা এ-পকেট ও-পকেট নাড়া দিলুম্—দশবার ক'রে সমস্ত জিনিষপত্র হাট্‌কে খোঁজাখুঁজি ক'র্‌লুম্। আমাদের বোঝ্‌বার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েচে। কে নিতে পারে? এ ঘরে তো -

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "ব্যস্ত হ'য়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান ব'লেই ছোটোরাণী ঐ চাবিটা বিশেষ ক'রে তার বাক্সে তুলে রেখেচে।"

আমার ভারি গোলমাল ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। আমাকে না জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের ক'রে নেবে এ তার স্বভাব নয়। আমার খাবার সময় আজ বিমল ছিলো না— সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে ব'সে খাওয়াচ্ছিলো। মেজোরাণী তাকে ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলেন— আমি বারণ ক'র্‌লুম্।

খেয়ে উঠ্‌চি এমন সময় বিমল এলো। আমার ইচ্ছা ছিলো মেজোরাণীর সাম্‌নে এই চাবি-হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর ঘ'ট্‌লো না। বিমল আস্‌তেই তিনি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "ঠাকুরপোর লোহার সিন্ধুকের চাবি কোথায় জানিস্?"

বিমল ব'ল্‌লে, "আমার কাছে।"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "আমি তো ব'লেছিলুম্! চারি-দিকে চুরি ডাকাতি হ'চ্চে ছোটোরাণী বাইরে দেখাতো ওর ভয় নেই কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হ'তে ছাড়ে নি।"

বিমলার মুখ দেখে মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগ্‌লো— ব'ল্‌লুম্, "আচ্ছা, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক্, বিকেলে টাকাটা বের ক'রে নেবো।"

মেজোরাণী ব'লে উঠ্‌লেন, "আবার বিকেলে কেন

ঠাকুরপো, এইবেলা ওটা বের ক'রে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।”

বিমল ব'ল্‌লে, “টাকাটা আমি বের ক'রে নিয়েচি।”

চ'ম্‌কে উঠ্‌লুম্‌।

মেজোরাণী জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, “বের ক'রে নিয়ে রাখ্‌লি কোথায় ?”

বিমল ব'ল্‌লে, “খরচ ক'রে ফেলেচি।”

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, “ওমা, শোনো একবার! এতো টাকা খরচ কল্লি কিসে ?”

বিমল তার কোনো উত্তর ক'র্‌লে না। আমিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম্‌ না—দরজা ধ'রে চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম্‌। মেজোরাণী বিমলকে কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন; আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লেন, “বেশ ক'রেচে নিয়েচে। আমার স্বামীর পকেটে বাক্সে যা-কিছু টাকা থাক্‌তো সব আমি চুরি ক'রে লুকিয়ে রাখ্‌তুম্‌, জান্‌তুম্‌ সে টাকা পাঁচভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা—কতো খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জানো। তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে টাকা রক্ষা পাবে। এখন চলো, একটু শোবে চলো।”

মেজোরাণী আমাকে শোবার ঘরে ধ'রে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চ'লেচি আমার মনেও ছিলো না। তিনি আমার বিছানার পাশে ব'সে প্রফুল্ল মুখে ব'ল্‌লেন, “ওলো ও ছুটু, একটা পান দে তো ভাই। তোরা যে একেবারে

বিবি হ'য়ে উঠ্‌লি! পান নেই ঘরে? না হয় আমার ঘর থেকে আনিয়ে দেনা।”

আমি ব'ল্‌লুম্, “মেজোরাণী, তোমার তো এখনো খাওয়া হয় নি।”

তিনি ব'ল্‌লেন, “কোন্ কালে।”

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে ব'সে যা-তা ব'ক্‌তে লাগ্‌লেন, কতো রাজ্যের কতো বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্চে। বিমল কোনো সাড়া দিলে না। মেজো-রাণী ব'ল্‌লেন, “ও কি, এখনো তোর খাওয়া হয়নি বুঝি? বেলা যে ঢের হ'লো।—এই ব'লে জোর ক'রে তাকে ধ'রে নিয়ে গেলেন।”

সেই ছ-হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্ধুকের টাকা বের ক'রে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝ্‌তে পার্‌লুম্। কি রকমের যোগ সে কথা জান্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌লো না—কোনোদিন সে প্রশ্নও ক'র্‌বো না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপ্‌সা ক'রেই টেনে দেন—আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু-কিছু ব'দ্‌লে মুছে পূরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুল্‌বো এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্ত্তার ইসারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি ক'রে তু'ল্‌বো, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত ক'রে দেখাবো এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতোদিন কাটিয়েচি! প্রবৃত্তিকে কতো বঞ্চিত ক'রেচি নিজেকে কতো দমন ক'রেচি সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে, কারো জীবন একলার জিনিষ নয়—সৃষ্টি যে ক'রবে সে নিজের চারদিক নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিলো যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টান্‌বো। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পার্‌বো না এই ছিলো আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম্ নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারিদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে তারা এক-জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েচি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েচি তারা আমার আর-সবই নিয়েচে কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিষটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হ'লো। সব-চেয়ে যেখানে সহায় চাই সব-চেয়ে সেখানেই এক্‌লা হ'লুম্। এই পরীক্ষাতেও জিতবো এই আমার পণ রইলো। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার এক্‌লারই পথ।

আজ সন্দেহ হ'চ্চে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিলো। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁৎ ক'রে ঢালাই ক'র্‌বো আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে ক'রে

গ'ড়ে তুল্‌তে গেলেই মরে-গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়। এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হ'য়ে গেছি তা জান্‌তেই পারিনি। বিমল নিজে যা হ'তে পার্‌তো তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠ্‌তে পারেনি ব'লেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলেচে। এই ছ'হাজার টাকা আজ ওকে চুরি ক'রে নিতে হ'য়েচে,—আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার ক'র্‌তে পারেনি, কেননা ও বুঝেচে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মতো এক-রোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলেনা তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট ক'রে তুলি। আমরা সহধর্ম্মিণীকে গ'ড়্‌তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তা হ'লে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধ্‌তে চাইবো না—কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে ব'ল্‌বো, তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক্, আমার ফরমাস একেবারে চাপা পড়ুক্—তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক্, আমার ইচ্ছা লজ্জিত হ'য়ে ফিরে যাক্।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জম্‌ছিলো সেটা আজ এমনতর একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে প'ড়েচে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের

শুশ্রূষা কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে ? যে আব্রুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আব্রু যে একেবারে ছিন্ন হ'য়ে গেলো ! ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাক্‌বো—বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল ক'রে রাখ্‌বো—একদিন এমন হবে যে, এই ক্ষতর চিহ্ন পর্য্যন্ত থাক্‌বে না কিন্তু আর কি সময় আছে ? এতো-দিন গেলো ভুল বুঝ্‌তে, আজকের দিন এলো ভুল ভাঙ্‌তে, কতোদিন লাগ্‌বে ভুল শোধ্‌রাতে ! তার পরে ? তারপরে ক্ষত শুকোতেও পারে কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে ?

একটা কি খট্ ক'রে উঠ্‌লো—ফিরে তাকিয়ে দেখি বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্চে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো—ঘরে ঢুক্‌বে কি না-ঢুক্‌বে ভেবে পাচ্ছিলো না—শেষে ফিরে যাচ্ছিলো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাক্‌লুম্ বিমল ! সে থ'ম্‌কে দাঁড়ালো তার পিঠ ছিলো আমার দিকে আমি তাকে হাতে ধ'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম্।

ঘরে এসেই মেঝের উপর প'ড়ে মুখের উপর একটা বালিস আঁক্‌ড়ে ধ'রে তার কান্না ! আমি একটি কথা না ব'লে তার হাত ধ'রে মাথার কাছে ব'সে রইলুম্।

কান্নার বেগ্ থেমে গিয়ে উঠে ব'স্‌তেই, আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা ক'র্‌লুম্। সে একটু

জোর ক'রে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'র্‌তে লাগ্‌লো। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে গদ্‌গদ-স্বরে ব'ল্‌লে, "না, না, না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পূজো ক'র্‌তে দাও।"

আমি তখন চুপ্‌ ক'রে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য,—সে দেবতা কি আমি, যে, আমি সঙ্কোচ ক'র্‌বো?

বিমলার আত্মকথা

চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো,—সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেচে সেই সাগর-সঙ্গমে। সেই নির্ম্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করিনে,—আপনাকেও না, আর কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেচি —যা পোড়্বার তা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই-আমি আপনাকে নিবেদন ক'রে দিলুম্ তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ ক'রেচেন।

আজ রাত্রে ক'ল্কাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর বাহিরের নানা গোলমালে জিনিষপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে ব'স্লুম্। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুট্লেন। আমি ব'ল্লুম্, "না, ও হবে না,—তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েচো।"

আমার স্বামী ব'ল্লেন, "আমিই যেন কথা দিয়েচি কিন্তু আমার ঘুম তো কথা দেয় নি,—তার যে দেখা নেই।"

আমি ব'ল্লুম্, "না সে হবে না—তুমি শুতে যাও।"

তিনি ব'ল্লেন, "তুমি একলা পারবে কেন?"

খুব পারবো।

আমি না হ'লেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি ক'রতে চাও করো, কিন্তু তুমি না হ'লে আমার চলে না। তাই একলা ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এলো না।

এই ব'লে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময় বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেচেন, তিনি খবর দিতে ব'ললেন।

খবর কাকে দিতে ব'ললেন সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার জোর ছিলো না। আমার কাছে এক মুহূর্ত্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মতো সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো।

আমার স্বামী ব'ললেন, "চলো বিমল শুনে আসি সন্দীপ কি বলে। ও তো বিদায় নিয়ে চ'লে গিয়েছিলো আবার যখন ফিরে এসেচে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।"

যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াটাই বেশি লজ্জা ব'লে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম্। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখ্‌ছিলো। আমরা যেতেই ব'লে উঠ্‌লো—তোমরা ভাব্‌চো লোক্‌টা ফেরে কেন? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হ'লে প্রেত বিদায় হয় না।

এই ব'লে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁট্‌লি বের ক'রে টেবিলের উপরে খুলে ধ'র্‌লে। সেই গিনিগুলো। ব'ল্‌লে, "নিখিল, ভুল ক'রোনা, ভেবোনা হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে প'ড়ে সাধু হ'য়ে উঠেছি। অনু-তাপের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে এই ছ'-হাজার টাকার

গিনি ফিরিয়ে দেবার মতো ছিঁচ্‌কাদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু—

এই ব'লে সন্দীপ কথাটা আর শেষ ক'র্‌লে না। একটু চুপ্‌ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে, "মক্ষিরাণী, এতোদিন পরে সন্দীপের নির্ম্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেচে—রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই ক'রে দেখ্‌চি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়—তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্ব্বনাশিনী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম্‌ আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লুম্‌ পৃথিবীতে কেবল-মাত্র তারই ধন আমি নিতে পার্‌বো না—তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হ'য়ে তবে বিদায় পাবো, দেবী! এই নাও!—"

ব'লে সেই গয়নার বাক্সটিও বের ক'রে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চ'লে যাবার উপক্রম ক'র্‌লে। আমার স্বামী তাকে ডেকে ব'ল্‌লেন, "শুনে যাও, সন্দীপ!"

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ ক'রে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখ্‌বার মৎলব ক'রেচে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়্‌তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে। অতএব এখনকার মতো চ'ল্‌লুম্‌—তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেবো। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি

দেরি ক'রো না। মক্ষিরাণী, "বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃৎপিণ্ড-মালিনীং!"

এই ব'লে সন্দীপ প্রায় ছুটে চ'লে গেলো। আমি স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম্! গিনি আর গয়নাগুলো যে কতো তুচ্ছ সে আর-কোনোদিন এমন ক'রে দেখ্‌তে পাইনি। কতো জিনিষ সঙ্গে নেবো কোথায় কি ধরাবো, এই কিছু আগে তাই ভাব্‌ছিলুম্, এখন মনে হ'লো কোনো জিনিষই নেবার দরকার নেই—কেবল বেরিয়ে চ'লে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধ'রে আস্তে আস্তে ব'ল্‌লেন, "আর তো বেশি সময় নেই এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক্!"

এমন সময় চন্দ্রনাথ বাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সঙ্কুচিত হলেন—ব'ল্‌লেন, "মাপ ক'রো মা, খবর দিয়ে আস্‌তে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেচে! হরিশকুণ্ডুর কাছারি লুঠ হ'য়ে গেছে সে-জন্যে ভয় ছিলো না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ ক'রেচে সে তো প্রাণ থাক্‌তে সহ্য করা যায় না!"

আমার স্বামী ব'ল্‌লেন, "আমি তবে চ'ল্‌লুম্।"

আমি তাঁর হাত ধ'রে ব'ল্‌লুম্, "তুমি গিয়ে কি ক'র্‌তে পার্‌বে? মাষ্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।"

চন্দ্রনাথ বাবু ব'ল্‌লেন, "মা, বারণ ক'র্‌বার তো সময় নেই।"

আমার স্বামী ব'ল্‌লেন, "কিচ্ছু ভেবোনা বিমল।"

জানালার কাছে গিয়ে দেখ্‌লুম্ তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিলো না।

একটু পরেই মেজোরাণী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই ব'ল্‌লেন, "ক'র্‌লি কি, ছুটু, কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন?"—বেহারাকে ব'ল্‌লেন, ডাক্ ডাক্ শীগ্‌গির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন। দেওয়ানবাবুর সাম্‌নে মেজোরাণী কোনো দিন বেরোন নি। সে দিন তাঁর লজ্জা ছিলো না। ব'ল্‌লেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আন্‌তে শীগ্‌গির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু ব'ল্‌লেন, "আমরা অনেক মানা ক'রেচি, তিনি ফির্‌বেন না।"

মেজোরাণী ব'ল্‌লেন, "তাঁকে ব'লে পাঠাও, মেজোরাণীর ওলাউঠো হ'য়েচে—তার মরণকাল আসন্ন।"

দেওয়ান চ'লে গেলে মেজোরাণী আমাকে গাল দিতে লাগ্‌লেন, রাক্কুসী, সর্ব্বনাশী! নিজে ম'র্‌লিনে, ঠাকুরপোকে ম'র্‌তে পাঠালি।

দিনের আলো শেষ হ'য়ে এলো। জানালার সাম্‌নে পশ্চিম দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত সজ্‌নে গাছটার পিছনে সূর্য্য অস্ত গেলো। সেই সূর্য্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটী আজও আমি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি। অস্তমান সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুইভাগে ছড়িয়ে পড়েছিলো, একটা প্রকাণ্ড পাখীর ডানা মেলার মতো,—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো।